বাংলাপিডিএফ

উচ্চ জীবন

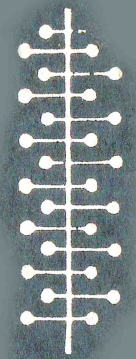

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

রনি

উচ্চ জীবন

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

বইটি সাবধানতা এবং মমতার
সাথে ব্যবহার করুন।

মোঃ রোকনুজ্জামান খনি
ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

বাংলা একাডেমীর পক্ষে
পরিবেশক
আহমদ পাবলিশিং হাউস

বাংলা একাডেমীর পক্ষে
প্রকাশক
মহিউদ্দীন আহমদ
আহমদ পাবলিশিং হাউস
৭, জিন্দাবাহার প্রথম লেন,
ঢাকা—১

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৯

চতুর্থ প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০

প্রচ্ছদপট
মোতাহারুল হক চৌধুরী

মুদ্রাকরঃ
এম. এ. আশরাফ
কোয়ালিটি প্রিণ্টার্স
৬, রজনী বোস লেন,
আরমানীটোলা, ঢাকা—১

মূল্যঃ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান রচিত 'উচচ জীবন' প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ অতি অল্প সময়ে নিঃশেষিত হয়েছে। পাঠকগণের আগ্রহে এখন এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে।

১লা বৈশাখ
১৩৭৭

কবীর চৌধুরী
পরিচালক ঃ বাংলা একাডেমী

প্রথম সংস্করণের প্রসঙ্গ-কথা

ডাক্তার লুৎফর রহমান বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় নাম। যে কয়জন মুসলমান সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম রেনেসাঁর ক্ষেত্রে স্বনামধন্য হয়েছেন, লুৎফর রহমান তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর স্বচ্ছ চিন্তা, উদার দৃষ্টিভঙ্গী, গভীর মনীষা আমাদেরে নতুন চিন্তার খোরাক জোগাতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিমূলক প্রবন্ধগুলি সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা একাডেমী থেকে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সে পরিকল্পনা অনুসারে ইতিমধ্যে শেখ আবদুর রহীম ও শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্নের গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় উন্নত জীবনে গৃহীত প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। এই মূল্যবান প্রবন্ধগুলি লোকচক্ষুর অগোচরে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে উদ্ধার করে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হলো। আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি আমাদের বাংলা সাহিত্য-সম্পদকে সমৃদ্ধিশালী করবে। বেগম সালেহা খাতুন উক্ত পত্রিকা থেকে প্রবন্ধগুলি সংকলন করে সাহিত্য-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

সৈয়দ আলী আহ্সান
পরিচালক : বাংলা একাডেমী

আষাঢ় ১৩৬৯

ভূমিকা

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে মোহাম্মদ লুৎফর রহমান নিঃসন্দেহে কীর্তিমান পুরুষ। বিশ শতকের গোড়াতে তাঁর সাহিত্য-জীবন শুরু হয় 'প্রকাশ' কবিতা পুস্তকের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য এটি তাঁর প্রথম ও শেষ কবিতা গ্রন্থ রচনা। পরবর্তী জীবনে তিনি প্রবন্ধকার হিসাবেই পরিচিত হন। মীর মোশারফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, লুৎফর রহমান এ তিন জনকে বাংলা গদ্যে প্রথম শ্রেণীর মুসলমান গদ্য লেখক বলে গণ্য করা যায়। শুধু মুসলিম গদ্য লেখক হিসাবে নয়, বাংলা গদ্য লেখকদের মধ্যেও এই তিন জন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

"মানুষের জন্য অপরিসীম দরদ ও বেদনা-বোধ আধুনিক কালের বাঙালী সাহিত্যিকদের বিশিষ্ট করে তুলেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলার সাহিত্যে মানুষ তার স্বকীয় মহিমায় ও স্বাতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হলো। পশ্চিমের ব্যক্তি জাগরণের প্লাবন বাংলার মাটিকেও সিক্ত করতে ছাড়লো না। বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্যে দেবতা ও সামন্ততন্ত্রের হাতে সাধারণ মানুষের যে লাঞ্ছনা হয়েছে এবং তার ব্যক্তিত্বকে যে ভাবে অস্বীকার করা হয়েছে, একালের সাহিত্য তারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছিলেন কাব্যে মধুসূদন এবং বিহারীলাল আর প্রবন্ধ ও গল্প উপন্যাসাদিতে বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিম প্রমুখ মনীষীরা। মানবতার এ আদর্শই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল এবং সুস্পষ্ট রূপ লাভ করেছে। ডাক্তার মোহাম্মদ লুৎফর রহমানও মানুষের এ ব্যক্তি জাগরণ ও মানবতা-মন্ত্রেরই সাধক।

"লুৎফর রহমানের 'Humanism' বোধে ও মানবতার সাধনায় তাঁর পূর্বসূরীদের সঙ্গে তুলনায় কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সে পার্থক্যই সাহিত্য ও সামাজিক জীবনে তাঁর বৈশিষ্ট্যের

পরিচায়ক। মানবতা বা জাতীয়তার একটা ব্যাপক ও সার্বজনীন রূপ তিনি ধ্যান করেননি। তাঁর আরাধ্য ছিল 'Individual' মানুষ। ব্যক্তি মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের পথই হলো তাঁর মতে চরিত্র গঠন ; আত্মশক্তিতে বিশ্বাস এবং আত্মার উৎকর্ষ সাধন। দয়ামায়া, স্নেহমমতা, পরোপকার প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির চর্চা ও সাধনায় মানুষ লাভ করতে পারে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। তিনি ভাবতেন মর্যাদাবান শরীফ সে-ই যে চরিত্রবান ; যে সত্যোপাসক, যে জ্ঞানসাধক। লুৎফর রহমান বিশ্বাস করতেন সমাজ-জীবনকে সুন্দর করে রচনা করতে হলে, জাতীয় চরিত্রকে উন্নত ও মহীয়ান করে তুলতে হলে ব্যক্তির জীবন আদর্শায়িত করে তুলতে হবে। ব্যক্তি জীবন রচনার এ কাজ সম্ভব হতে পারে জাতি গঠনের ভার যাদের ওপর সেই মায়েদের জাত নারীর জাগরণে ; নারীর চিত্তবিকাশ ও আত্মোন্নতির ফলে। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনার প্রারম্ভিক হিসেবে তাই দেখা যায় তিনি সমাজে নারীর নতুন মূল্য নিরূপণ করতে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। এ ব্যাপারে একই সঙ্গে তিনি 'Idealist ও realist'. আইডিয়ালিস্ট এ জন্যে যে মানুষকে পূর্ণ মনুষ্যত্বে বিকশিত করে তুলবার জন্যে এ-ও তাঁর এক স্বপ্ন-কল্পনা এবং রিয়্যালিস্ট এ জন্যে যে এ উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্যে তাঁকে বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে দেখতে পাচ্ছি। তাঁর 'নারী শক্তি' বলে পত্রিকা চালানো এবং 'নারী তীর্থ' নামক নারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা একই সঙ্গে নারী জাগরণে সহায়তা করেছে এবং অগণিত অসহায়া নারীর স্বাধীন জীবিকার্জনের পথ করে দিয়েছে। তিনি এ কালের 'Knight' উপাধি পেয়েছিলেন, অনেকে তেমনি তাঁকে 'Eccentic' বলতেও ছাড়েননি।" [বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান]

লুৎফর রহমান যশোহর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। পেশায় তিনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। তাঁর মনের আশ্চর্য রকমের উদারতা ও মহৎ প্রাণতা সত্যসত্যই

আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর প্রবন্ধ পুস্তকগুলিতে আমরা একদিকে পাই জ্ঞানানুশীলনের পরিচয়, অন্যদিকে পাই কোমল অনুভূতির সঙ্গে যুক্তিতর্কের সমন্বয়ের পরিচয়। সর্বোপরি তিনি একমাত্র মুসলিম গদ্য লেখক যিনি কথ্যরীতিতে গদ্য রচনা করে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রবর্তিত পথে তিনি অগ্রসর হয়ে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দুরারোগ্য ক্ষয়রোগে তিনি ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁর রচিত পুস্তকগুলো হচ্ছে—

১. উচচ জীবন, ২. উন্নত জীবন, ৩. মানব জীবন, ৪. সত্য জীবন, ৫. মহৎ জীবন, ৬. পথহারা, ৭. ছেলেদের মহত্ত্ব কথা, ৮. ছেলেদের কারবালা, ৯. রাণী হেলেন, ১০. বাসর উপহার, ১১. প্রীতি উপহার, ১২. সরলা, ১৩. রায়হান।

'সরলা' ও 'রায়হান' দুটি উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ। 'বাসর উপহার' ও 'প্রীতি উপহার' পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের নানা উপদেশে পূর্ণ গ্রন্থ।

'উন্নত জীবন' ইত্যাদি গ্রন্থে জীবনকে কী-ভাবে মহৎ ও উন্নত করা যায় তারই উপদেশ অতি সুন্দর ভাষায় বিবৃত করা হয়েছে। 'উচচ জীবন' গ্রন্থ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে। (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা—শ্রাবণ ১৩২৮ থেকে বৈশাখ ১৩২৯) সমগ্র গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত---১. নারী-পুরুষ ২. শহর ও পল্লীজীবন ৩. জীবনের ব্যবহার ৪. পিতৃ-মাতৃ ভক্তি। প্রথম অধ্যায়ে নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে। নারীকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করাই লুৎফর রহমানের প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। প্রেমের মর্যাদাকে তিনি স্বীকার করেন। সংসার নারীপুরুষের প্রেম-প্রীতিতেই সুখময় হতে পারে। আর নারী শুধু সেবাদাসী নয়---ভোগের পাত্রী নয়---কর্মের প্রেরণাদাত্রীও বটে। নারীর অধিকারকে যেমন তিনি স্বীকার করেছেন তেমনি নারীর কর্তব্যের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শহর ও পল্লীজীবনের পার্থক্য দেখিয়েছেন, শহরের কৃত্রিমতা, পল্লীবাসীর সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি সমস্ত রকমের দোষক্রটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। এই অধ্যায়েও প্রবন্ধকার নারীর দুর্দশার প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। পতিতা অসহায়া নারীর প্রতি তাঁর কী অপরিসীম দরদ ছিল, এই অধ্যায়ে তা পরিস্ফুট হয়েছে। 'নারী তীর্থ' নামক আশ্রম প্রতিষ্ঠা তাঁর সেই দরদেরই বাস্তব অভিব্যক্তি।

তৃতীয় অধ্যায়ে জীবনের ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে। অলসভাবে সময় নষ্ট করা কোনক্রমেই উচিত নয়। 'জীবনে কাজ করতে হবে। কাজহীন জীবন শত পাপের আবাস।' জ্ঞানের সাধনায় জীবনকে নিয়োজিত করতে হবে। জ্ঞানের সাধনা ব্যতীত কোন জাতি বড় হতে পারে না। ব্যর্থতায় হতাশ হওয়া কোন মতেই উচিত নয়। বিশ্বাসই আমাদের সাফল্য এনে দেবে। দুঃখ-বেদনার ভিতর দিয়েই মনুষ্যত্বের পূর্ণ জাগরণ হবে। লুৎফর রহমান এই কথাই বিশ্বাস করেন। দেশ-বিদেশের মহৎ ব্যক্তিদের উদাহরণ তিনি আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। ইসলামের মহান আদর্শের কথা বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এখানেও নারীর প্রতি লেখকের সমান সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। নারী যেন স্বাবলম্বী হতে পারে একথা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন এবং সে পথের তিনিই প্রদর্শকও।

চতুর্থ অধ্যায়ে পিতামাতার প্রতি সন্তানের ব্যবহার কেমন হওয়া উচিত তা-ই বর্ণনা করেছেন। হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর বিখ্যাত উক্তি দিয়ে তিনি প্রবন্ধ আরম্ভ করেছেন—'মায়ের পায়ের তলায় স্বর্গ।'

পারিবারিক জীবন সম্পর্কে লেখক এই অধ্যায়ে নানাবিধ সমস্যার উত্থাপন করেছেন এবং সমাধানও দেখিয়েছেন। বংশ মর্যাদার কোন মূল্যই নেই যদি না নিজ চরিত্রবলে নিজ কীর্তিতে কেউ বড় হতে না পারে। নারীর কর্তব্য সম্পকেও তিনি আবার ইঙ্গিত করেছেন শেষ - পরিচ্ছেদে।

আজ থেকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে লেখা হলেও আজকের দিনে এ প্রবন্ধগুলোর আত্যন্তিক মূল্য ও গুরুত্ব কম নয়। আমাদের জীবনকে মহৎ করে গড়ে তুলতে এ প্রবন্ধগুলো যথেষ্ট সহায়তা করবে আর আমাদের চিন্তার খোরাক জোগাবে একথা অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট এবং মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্সান লিখিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' এ-পুস্তক সঙ্কলনে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

সালেহা খাতুন

নারী-পুরুষ

এমন মানুষ নেই যার নারীর প্রতি একটা টান নেই,...এ টান মোটেই দোষের নয়।

যখন আকাশ থেকে আদি পুরুষ পৃথিবীতে এলেন, তখন তাঁর বড় শূন্য বোধ হতে লাগল। খোদা তাঁকে এক পত্নী দিলেন—যিনি হলেন তাঁর সঙ্গিনী ও বন্ধু।

নারী তো মানুষের বন্ধু। আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বিপদ ঝঞ্ঝার চাপে পড়ে কাঁপছ, কাছে তোমার পত্নী রয়েছে; তার হাত ধরলে তোমার বুকে বিপুল উৎসাহ আসবে। একার পক্ষে সে আঘাত সহ্য করা তোমার হতো না।

যে কারণে বেঁচে আছ সেই শুভ উদ্দেশ্যকে সার্থক করবার জন্যে তুমি নারীর সঙ্গে মিলিত হতে পার,—অন্য কোন কারণে নয়। অসত্য ও পাপকে অবলম্বন করে যদি প্রতিষ্ঠা চাও, তবে নারীকে তোমার সঙ্গিনী হবার জন্য আহ্বান করো না—এ জন্যে নারীর সৃষ্টি হয়নি! তোমার পুণ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে নারী এসেছিল—তার সৌন্দর্য-সুষমার অপব্যবহার করো না।

তারই নারীর সঙ্গে প্রেম করবার অধিকার আছে, যে নিজকে সত্যের সৈনিকরূপে প্রচার করে। যে এ জগতে পাপ ও অন্যায়কে দলিত করবার জন্যে বেঁচে আছে—যে মানুষ, যে মিথ্যার উপাসক নয়।

বড় কাজের পথে নারী অন্তরায় এ বিশ্বাস করো না। তোমাকে জয়যুক্ত করবার জন্যেই তো নারীর আগমন। তোমার দুর্বল বাহুতে, তোমার ভাঙ্গা মনে শক্তি দেবার জন্যেই তো সে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে।

যে নারী স্বামীর সাধনা পথের সহায় না হয়ে অন্তরায় হয়েছেন তিনি তার নারী জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

লর্ড বেকন (Lord Bacon) বলেছেন, বিয়ে করলে বড় কাজ করবার ক্ষমতা থাকে না। রাতদিন তাকে ভাতের ভাবনা ভাবতে হয়,—সে জীবনের কাজ কি করবে?

কতকগুলি মানুষ সন্ন্যাসী থেকে মানব জাতির কল্যাণের জন্যে জীবন উৎসর্গ করুক, এ আমি চাইনে। সমাজের সেবায় কারো এত বড় ত্যাগ স্বীকারের আবশ্যকতা নেই। তিনি বড় হতে পারেন, কিন্তু তাঁর এই নীরব জীবন দেখে আমার মনে কষ্ট হয়। আমি এ সেবা চাইনে।

পিতা ভাই বা স্বামীরূপে যে মানব পরিবারের স্পর্শে আসে নাই সে কোন বিশেষ পথে জীবনকে সার্থক করতে পারে, কিন্তু মানুষের ব্যথা ঠিক ঠিক বোঝবার ক্ষমতা তার হয়তো হয় না। তার প্রকৃতিও তেমন সরস হয় না।

নারী পুরুষের রক্তে-মাংসে জড়িয়ে আছে, সে তাকে কেমন করে অস্বীকার করবে? দুঃখ বেদনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে যে বিয়ে করে না—সে কাপুরুষ। উপবাসক্লিষ্ট পরিবারের দুঃখদগ্ধ উপাসনা খোদার দুনিয়াকে বড় মধুর করে তুলেছে। নারী পুরুষ মিলিত হলে যদি জগতের দুঃখ বাড়ে, বাড়ুক,—সে দুঃখ ব্যথাকে জয় করতে হবে। আগেই একেবারে দুঃখ হতে পালাতে চেষ্টা করো না,—তা হলে খোদার সঙ্গে প্রেম করাটাই মিছে হয়ে যাবে।

জগতের অনেক বড়লোক চিরকুমারই ছিলেন। তাঁদের জীবনের বিশেষ বিশেষ কাজকেই যেন তাঁরা বিয়ে করেছিলেন। গ্যালিলিও, ডেকার্টে এবং ক্যাভেনডিস (Cavendish) ছিলেন অবিবাহিত। ক্যাভেনডিস নারী জাতিকে বড় ঘৃণা করতেন। বাড়ীর কোন মেয়ে ভৃত্যের তাঁর সামনে উপস্থিত হওয়া একেবারে নিষেধ ছিল, হঠাৎ কোন গতিকে সামনে পড়লে তার তখন চাকরি যেত। তিনি ছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক—প্রাণ তাঁর ছিল নীরস ও কঠিন, যেখানে একরত্তি ভালবাসা বা মায়া স্থান পেত না।

ঐতিহাসিক হিউম (Hume), গিবন ও মেকলেও বিয়ে করেননি। গিবন (Gibbon) একবার ভালবাসায় পড়েছিলেন, কিন্তু পিতার আদেশে প্রণয়িনীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হন। যেখানে ভালবাসাটা তত গভীর নয়, সেখানেই কারো আদেশে এর হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

জেরেমী বেনথাম (Jeremy Bentham) জীবনের প্রথম বয়সে এক নারীকে ভালবাসেন। বুড়োকালে যখন সেই বাল্য-প্রণয়িনীর কথা তাঁর মনে পড়ত তখন তিনি বালকের মত রোদন করতেন। ভালবাসার প্রতি-দান না পেয়ে—চিরকালই তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বড় দার্শনিক।

রাজনীতিবিশারদ পিট ফক্স (Pit Fox) কোন নারীর পাণি গ্রহণ করেননি। জীবনের সাধনার পথে পত্নী বাধা হবে ভেবে পিট কঠিন সংযম বরণ করে নিয়েছিলেন। যে নারীকে তিনি ভালবেসে-ছিলেন তিনি ছিলেন খুব সুন্দরী। তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করতে পারেননি; এজন্য তাঁর প্রাণে বড় বেদনা বেজেছিল। তিনি ভাল করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন তা বলতে পারিনেঃ ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে খেলা করা ছিল পিটের জীবনের একটা মহা আনন্দের বিষয়।

চিত্রকর র‍্যাফেলো (Raphael); মাইকেল এঞ্জেলো (Michael Angelo) নারীকে আমল দেননি। রেনলড্‌সের (Reynolds) ধারণা ছিল বিয়ে করলে ভাল চিত্রকর হওয়া যায় না। সৌন্দর্য ও রসবোধ তার নষ্ট হয়ে যায়। এক বন্ধু চিত্রকরকে বিয়ে করতে দেখে তিনি চীৎকার করে বলে উঠেছিলেন, এইবারই তোমার চিত্র আঁকা শেষ হবে। বস্তুতঃ তাঁর এ মন্তব্যের মূলে কিছু সত্য থাকলেও চিত্রকর বন্ধুর বিয়ে করাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। কোন বাস্তব সুন্দরীর স্পর্শে পাছে কল্পনা সুন্দরীর অন্তর্ধান হয় এই ভয়ে হয়তো বন্ধুকে সতর্ক করেছিলেন।

সঙ্গীত বিদ্যাবিশারদ বেথোভেন (Bethoven) যদি হতাশ প্রেমিক না হতেন তা হলে হয়তো তার সঙ্গীত-বিদ্যায় এত পারদর্শিতা ঘটত না। খুঁজেও সারা জীবন তিনি একটা মনের মানুষ পাননি। আশা ও আনন্দহীন

হৃদয় নিয়ে তিনি গানের চর্চায় মন দিয়েছিলেন এবং তাতেই তিনি যথেষ্ট কীর্তি অর্জন করেছিলেন। অনেক নারীও চিরকাল কুমারী জীবন যাপন করে গিয়েছিলেন। কেউ হয়ত স্বাধীন থাকবার জন্যে, কেউ মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দাম্পত্য জীবনের সুখ ও দায়িত্ব হতে দূরে থেকে অনেকে সাহিত্য ও জ্ঞানের সেবা করে জীবন কাটিয়েছেন; কেউ কেউ প্রথম জীবনে কোন যুবককে ভালবেসেছিলেন, প্রতিদান না পেয়ে আর কোন কালে বিয়ে করেননি।

নারী বহুভাবে নিজেদের জীবনকে সার্থক করতে পারেন। তাই বলে বিয়ে না করে অন্য পথে নারী জীবনকে সফল করতে চেষ্টা করুক, এ আমি বলছিনে। আমার কথা নারী ইচ্ছা করলে পুরুষের ন্যায় নিজেদের জীবনকে মূল্যবান ও শ্রদ্ধেয় করে তুলতে পারেন। নীরবে অজানা অচেনা হয়ে; অসীম ধৈর্যে মঙ্গলময়ী নারী মানবজাতিকে যে সুখ ও আনন্দ দান করেন, তার তুলনা কোথায়?

বিদেশে কিরূপ হয় জানিনে, এদেশে কিন্তু নারীর সেবা ও স্নেহের কোন মূল্য নেই। সমাজের অত্যাচার তাদের কর্মশক্তিকে একেবারে চূর্ণ করে ফেলেছে। নারী বহু বড় কাজ করেছেন, ইতিহাস পড়লে তা জানা যায়। বিলেতের পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের হাসপাতালটি দুই সামান্য দরিদ্র মেয়ে কর্তৃক স্থাপিত হয়েছিল। মানুষের দ্বারে দ্বারে যেয়ে তারা ভিক্ষা করেছিলেন।

অসম্মান ও অভাবের চাপে পিষ্ট হওয়ার চেয়ে বিয়ে না করাই ভাল। বিয়ে করে যদি কতকগুলি লোকের কষ্ট বাড়ান হয় তা হলেও নারী পুরুষের মিলনের প্রয়োজন নেই। বিয়ে করে দাস জীবনের অগৌরব বাড়িয়ে আর লাভ কি?—এই কথা বলতে খুব ইচ্ছা হয়; কিন্তু কঠিনভাবে আদেশ করতে ভয় পাই। সতী স্ত্রী ও চরিত্রবান ব্যক্তির প্রণয় মিলন জগতের মর্যাদা ও শোভা বর্ধন করেছে।

নারীর যদি কর্মশক্তি থাকতো, সে যদি এত সরলা, এত ভীতা চকিতা, এত কৃপার পাত্রী না হতো তা হলে তার সঙ্গ লাভ মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হতো না। নারী যে মানুষের সকল অবস্থার সঙ্গিনী। আহারে-অনাহারে সুখে-ব্যথায় সম্মানে-অসম্মানে তার সহানুভূতি চাই,

অতএব কোন অবস্থায় তাকে বাদ দেওয়া চলে না। আমার কাঁদবার সময় আমি নারীর চোখেও অশ্রু দেখতে চাই, নইলে যে আমি মরে যাব।

যে দেশে নারীর কিছুমাত্র সম্মান নাই, যেখানে সে হাসলে মানুষ তাকে চরিত্রহীন বলে সন্দেহ করে, সেখানে তার কর্মশক্তি, তার মনুষ্যত্ব, তার বিবেক ও ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হবে কেমন করে? সেখানে নারী পুরুষ জীবনের কর্মপথের একটা বাধা ছাড়া আর কি? নারীর চোখ-মুখের সম্মোহন বিভার পাশে শক্তির শিখা জ্বালাও। সে শুধু ফুলের মতো মানুষের আরাম বর্ধন করবে না। হাতের যষ্টি হয়ে পুরুষ-সমাজের কল্যাণ বর্ধন করবে।

আল্লার নামে নারী-পুরুষের মিলন পার্থিব সকল কিছু অপেক্ষা মূল্যবান ও শ্রদ্ধার জিনিস। নারী-পুরুষের যথার্থ মিলন অতীব দুর্লভ। সত্য রকমের প্রণয় যারা করতে পেরেছে তারা সামান্য নয়।

ইসলাম কঠিন কর্তব্যের জন্যে প্রেম-প্রণয়কে প্রশ্রয় না দিলেও ইউসুফ-জোলেখার সুমহান আত্মদানকে অতীব উচচ স্থান দিয়েছে। মানুষের আত্মা প্রেম ও স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু নয়। প্রেম-স্বাধীনতা বাদ দিলে মানুষের কিছুই থাকে না। বহির্জগৎ হতে ধরে এনে ঘরে আবদ্ধ রেখে নারীর জীবনকে বর্তমানকালে ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। তাকে মানুষের প্রেমহীন কামুকতার উপকরণ করে তোলা হয়েছে; ইসলাম এ সমর্থন করে না। নারীর জীবন এত ছোট নয়।

কেউ কেউ শুধু রূপ দেখে বিয়ে করেন। নারী জীবনে রূপ একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তা স্বীকার করি। কোন এক বিখ্যাত সাহিত্যিক ইংরেজ মহিলা বলেছেন,—আমি আমার সমস্ত জ্ঞান বিসর্জন দিতে রাজী আছি, যদি বিনিময়ে রূপ মেলে। এই মহিলা দেখতে তত ভাল ছিলেন না।

রূপ মানুষকে অভিভূত করে ফেলে সত্য কিন্তু রূপের পাশে যদি গুণ না থাকে, নারীর রূপ যদি পুরুষের মনকে অধঃপতিত করে, তার রুচি ও মনুষ্যত্বকে খর্ব করে দেয়, তবে সে রূপকে বাদ দিতে হবে। নারী বলতেই সে রূপসী—তাকে ভালবাসার মত মন ও মহত্ত্ব চাই। ভালবাসা

না থাকলে শ্রেষ্ঠ রূপসীও মানুষকে আনন্দ দান করতে পারে না। নারী-পুরুষের মিলনের শুধু উদ্দেশ্য হচ্ছে—জীবনের দানকে সার্থক করে তোলা। শুধু ভোগের জন্যে রূপকে যে আদর করে, সে খুব ছোট।

নারীর মনে যদি রূপ না ফোটে তবে মুখের রূপে কেউ সত্যিকারের সুখ পায় না, স্থায়ী করে কেউ তাকে ভালবাসে না। বিরক্ত হয়ে দূরে সরে যায়—যে পারে সে নিতান্তই অপদার্থ ও হীন। নারীর রূপ কয়দিন থাকে? তার মনের লাবণ্যই স্থায়ী। সে বিভা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেবলই বাড়ে।

বস্তুতঃ যাকে ঠিক বন্ধু বলে বরণ করে নিতে মন আপত্তি তোলে না, সেই নারীকেই বিয়ে করা যায়। শুধু ভোগের জন্যে নারী পুরুষের মিলন নিরর্থক; কিন্তু আসলে কি দেখতে পাওয়া যায়? যে যুবক তাকে বিয়ে করতেই হবে। মেয়ে হলেই স্বামী গ্রহণ করতে হবে। নারী-পুরুষের মিলনের যে একটা উচ্চ রকমের সার্থকতা আছে, তা সমাজের কেউ মানে না।

দেখতে পাই, স্বামী পত্নী কেউ কারো হৃদয় বোঝেন না। কেউ কারো সাধনার খবর রাখেন না। নারীরা পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ব্যথা-বেদনা বোঝেন না, জীবনকে সার্থক করার জন্যে এ কি প্রকার আয়োজন? এমনভাবে নারী পুরুষের মিলন অবৈধ।

ভোগ জিনিসটা দোষের, এ আমি বলি না। বলি, শুধু শরীরের ভোগেই যেন জীবন শেষ না হয়। মানব জীবন এত ছোট নয়। যে ভোগের মাঝে কর্তব্য সম্পাদনের তৃপ্তি রয়েছে—সে ভোগ অতি সুন্দর ও কাম্য। এ ভোগকে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নিতে হবে, না নেওয়াটাই দোষের। পতির পাপে যদি পত্নীর মনে দুঃখ না আসে, দুরাচার স্বামীর উপহারে যদি নারীর প্রাণ উৎফুল্ল হয়ে উঠে; তবে বুঝবো হে নারী, নিজের জীবনকে তুমি ব্যর্থ করে দিয়েছ। পাপ ও নীচতার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্যেই নারী-পুরুষের মিলন, অতএব দাম্পত্য জীবনের কোন অংশে যদি পাপ আদর পায় তবে সে দাম্পত্য বন্ধন নিরর্থক।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে এক এক জাতির এক এক রকম ধারণা। কোন এক দেশের লোক গলা ফোলা মানুষকে খুব সুন্দর বলে মনে করে। গলা ফুললে মানুষকে কত বিশ্রী দেখায় তা সবাই জানেন। দেখতে দেখতে সেই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকগুলির রুচি এমনি বদলে গিয়েছে যে, যাদের গলা ফোলা নয় তাদেরকে তারা অসুন্দর বলে ঘৃণা করে। পত্নীর স্বামীর প্রতি যদি প্রেম ও শ্রদ্ধা না থাকে তা হলে হাজার সৌন্দর্যও চোখে লাগে না। গ্রামে শহরে সব জায়গাতেই এর অনেক হৃদয়-বিদারক দৃষ্টান্ত আছে।

অনেক সময় রূপের গর্ব বালিকা ও যুবতীদেরকে অহঙ্কারী ও দাম্ভিক প্রকৃতির করে তোলে। রূপ না থাকলে হয়তো তারা বিনয়ী হবেন, চিত্ত ও স্বভাবকে সুন্দর করে তুলতে চেষ্টা করবেন কিন্তু রূপের অভিশাপে মন ও স্বভাব তাদের কলঙ্কাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। কথা ও ব্যবহারেই মানুষকে বেশী করে মুগ্ধ করে। মানুষ যখনই বোঝে রূপের মধ্যে প্রেম, সহানুভূতি ও সুরুচির পরশ নেই তখন সে সরে পড়ে। ক্ষণিক আমোদের জন্যে মানুষ সে রূপ নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে পারে, কিন্তু সে রূপকে শ্রদ্ধা করে সে মাথায় তুলে নেয় না।

নারীর সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছি, পুরুষ সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। কুৎসিত বাহিরের অন্তরালে উন্নত পুরুষ আত্মাটা অপদার্থ নারীর কাছে সম্মান না পেতে পারে কিন্তু উন্নত-হৃদয়া নারী তাকে শ্রদ্ধা করেন, তাকে ভালবাসেন, তার জন্যে প্রাণ দেন। মনুষ্যত্বকে আদর করবার ক্ষমতা নারীদের মধ্যে প্রায়ই নেই, কারণ তাদের না আছে শিক্ষা, না আছে জ্ঞান। তারা অনেক সময় পুরুষকে অন্ধের মত মমতা করেন। উন্নত আত্মা ছাড়া অন্য কোথাও প্রেমের উন্মেষ হয় না, মনুষ্যত্বের প্রতিও শ্রদ্ধা-বোধ জাগে না।

মানুষের ভুল আছে। স্বামী-স্ত্রীর ভুল হবে। একজন আর এক-জনের ভুল নিয়ে যদি অনবরত টানাটানি করেন তা হলে সে বড় দোষের কথা হয়।

অনেক জায়গায় দেখা যায় স্বামী-স্ত্রীতে সর্বদা ঝগড়া লেগে আছে। যেন দুটি শত্রু এক পথের মাথায় হঠাৎ মুখোমুখি হয়েছেন ; পুরানো রাগ

মেটাবার জন্যে কোমর বেঁধে এখন তারা মারামারি করবেন। বিয়ের পর কিছুদিন ভালবাসার আদান-প্রদান, প্রণয়-চুম্বন, কবিতা পাঠ খুব চলতে থাকে কিন্তু তারপর কঠিন ঘরকন্নার মাঝে সে প্রেম সোহাগ লজ্জা পেয়ে পালিয়ে যায়। একজন আর একজনের দোষ অন্বেষণেই ব্যস্ত থাকেন। পত্নীর কর্তব্য বাড়ীর সকল কাজ গুছিয়ে নেওয়া; স্বামীর সকল রকম সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখা। স্বামীরও উচিত পত্নীর কাজে নিয়ত ভুল না ধরা। অতিরিক্ত ভুল ধরলে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, বুদ্ধি নির্বুদ্ধিতায় পরিণত হয়। নারীর ভুল ধরে ধরে মানুষ তাকে আরও পাগল করে তুলেছে। নারীর স্বাধীনতা ও শক্তি অর্জন ছাড়া তার কল্যাণ অসম্ভব।

স্বামী যদি বাহিরের কাজে রাতদিন ঘুরে বেড়ান, পত্নীর সঙ্গে মোটেই মিশতে না পারেন তাহলে পত্নী অনেক সময় বিরক্ত হন। শুধু বাহিরের কাজে মজে থাকা এবং পত্নীর ভাবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখাটা দোষের।

তুমি একজন বড় দরের লোক, পত্নী তোমার মর্যাদা বোঝেন না; তোমার সঙ্গে সম্ভ্রম করে কথা বলেন না; দাসীর মত পদ চুম্বন করেন না,—এই ভেবে যদি তোমার মন পত্নীর প্রতি বিরক্ত হয়ে ওঠে তাহলে বলবো তুমি হীন।

শুধু প্রেম করবার সময় পত্নীকে নিয়ে টানাটানি করা এবং বাকী সময় তার সঙ্গে অভদ্রতা করা বা তাকে কেবল কঠিন ভাষা প্রয়োগ করা নীচাশয়তা। বস্তুতঃ পত্নী যত ছোটই হোক; যত অপরাধই করুক তার সঙ্গে হাসি মুখ ছাড়া অন্যভাবে কথা বলা কাপুরুষতা।

শুধু একটি কারণে পুরুষ জাতি নারীর উপর বিরক্ত হতে পারেন —সেটি হচ্ছে নারীর ব্যভিচার। সতীত্বই নারীর শ্রেষ্ঠ গৌরব। ওটা যদি থাকে তবে আর কোন গুণ দরকার নেই। পত্নী অভিমানী, তিনি তোমাকে গালি দেন, সেবা সুখ দেন না। তার শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার জ্ঞান নেই—এ সমস্ত কারণে পত্নীর উপর বিরক্ত হয়ো না। প্রয়োজন হলে নিজে রান্না করে খাবে তবু পত্নীর সঙ্গে ঝগড়া করবে না। পত্নীর সঙ্গে কলহ করার মত কাপুরুষতা আর নেই।

নারী-জীবনে আর একটা গুরুতর অপরাধ আছে—সেটি হচ্ছে স্বামীর কাছ ছাড়া হয়ে কোন জায়গায় দীর্ঘ দিন থাকা। স্বামীর বিন্দুমাত্র আপত্তিতে নারীর কোথাও যাওয়া নিষেধ। যে নারী স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে চলে যেতে চায়, তাকে জোর করে ধরে রাখা ঠিক নয়।

স্বামী যেমন পত্নীর বহু অন্যায়কে মেনে নেবেন; পত্নীরও কর্তব্য স্বামীর ভুলকে তিনি ক্ষমা করবেন।

পুরুষের চরিত্রহীনতাকে নারী ক্ষমা করবেন কি না, কেমন করে বলবো? পুরুষ যখন নারীর চরিত্রহীনতাকে ক্ষমা করতে পারেন না, নারীও তেমনি পুরুষের চরিত্রহীনতাকে ক্ষমা করতে পারেন না। এই বিশ্বাসহীনতার দ্বারা বিবাহের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যায়। মানব-জীবনে হঠাৎ কোন সময়ে যদি কোন দুর্বলতা আসে; তবে সে জন্যে স্বামী এবং পত্নী উভয়ে উভয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন,—অনুতাপ ও পাপ স্বীকারে পাপের দোষ নষ্ট হয়ে যায়; এ যেন নারী-পুরুষ উভয়ের মনে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় চরিত্রহীনতার দোষে বহু স্বামী পত্নীকে হত্যা করেন; কিন্তু একই অপরাধে কোন নারী স্বামীকে হত্যা করেননি। পুরুষের বহু বিবাহ করবার ক্ষমতা আছে বলেই কি নারীর দাবীর প্রতি এই অমর্যাদা?

নারীর না আছে শিক্ষা, না আছে অর্থ, না আছে স্বাধীনতা। তার ভাব ও কথার কোন মূল্যও নেই। কন্যাকে জন্মদান করেই পিতারা সব কর্তব্য শেষ করেন। কবির কাব্য পড়ে কল্পনায় যুবকেরা মনের মাঝে যে নারী প্রতিমাকে গড়ে তোলেন, সংসার-ক্ষেত্রে ঢুকে তারা বিবাহিত পত্নীর মাঝে সে মানসীর সাড়া পেতে চান। কল্পনায় যা সম্ভব কাজে তার সন্ধান পেতে ঢের বিলম্ব হয়। পত্নীর মাঝে কল্পনা মানসীর দেখা না পেয়ে অনেক শিক্ষিত যুবকও নারীর উপর অত্যাচার করেন, এটা অন্যায়। মানসীকে জড় দেহে যদি পেতে চাও তবে এ যুগে বিয়ে না করাই মঙ্গল। কল্পনা সত্য হয়ে এ পর্যন্ত কোন মানুষের সামনে খাড়া হয়নি।

শিক্ষাহীনতার জন্যে নারী কল্পনার নারী হতে পারেন না। স্বামীর সংসার-কার্যে প্রকৃত সঙ্গিনী হবারও সুযোগ পান না। স্বামীর সাধনা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কিছুরই খবর রাখতে জানেন না; কিন্তু এ জন্যে নারী কি দায়ী? কে তাকে পাগলিনী করেছে? নারী শত অপরাধ করুক; সংসার-কার্যে শত বিশৃঙ্খলার পরিচয় দিক---বিরক্ত হয়ো না; কেবল একটু নম্র সরস সমালোচনা করতে পার। শুধু দেখবে সে তোমাকে ভালবাসে কি না।

অনেক সময় নারীরা খুব চাপা; প্রাণের ভালবাসা কেমন করে ব্যক্ত করতে হয়, তা জানেন না। এত অবোধ জীবন তাদের।

যুবক বয়সে নারীকে যে কত উপাদেয়, কত মনোহর মনে হয় তা ঠিক করে বলা কঠিন। সে যেন এক অজানা রাজ্যের রহস্যমাধুরী। যুগ যুগ ধরে তাকে তপস্যা করে পাওয়া কঠিন। সে মেঘের দোলায়, সাগর তরঙ্গে, বাতাসের মাঝে, দিগন্তের গায়, ঊষার শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতির ভিতর ঘুরে বেড়ায়।

কেউ কেউ হঠাৎ কোন নারীকে বিয়ে করে পরে অনুতাপ করতে থাকেন। বিবাহের এক বছর দু'বছর পরে পত্নীকে ত্যাগ করেন। ইহার মূলে কিছু সত্য থাকলেও পত্নীকে ত্যাগ করা লজ্জাজনক। ভুল যদি হয়েই থাকে তবে ভুলকে মেনে নিতে হবে। পত্নীর পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে চলতে হবে। নারী যত বড় ছোটই হোক তার ভিতর যদি সতীত্ব গৌরব থাকে তা হলে আর দুঃখের কোন কারণ নেই। পত্নী যদি নিরক্ষরা এবং কিছু অভদ্র হন কিংবা কোন অশিক্ষিত শ্রেণীর নারী হন তবে তাকে ভাল করবার জন্যে কখনও কঠিন কথা বলবে না, এতে তোমার সমূহ বিপদ হবে; পরিবারের অকল্যাণ হবে; বংশের অবনতি হওয়া সেখান হতেই শুরু হবে।

কোন কোন যুবক দূরদেশে কোন নারীকে বিয়ে করে কিছুকাল পরে পালিয়ে আসে। এযে কত বড় অপরাধ তা ভাষায় প্রকাশ করে বলা যায় না।

নারীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমি অনেক স্থানে অনেক কথা বলেছি। নারী-স্বাধীনতার অর্থ নারী-শক্তিকে জাগিয়ে তোলা, তাকে শিক্ষিত করা,

তার হাত পা ও মুখের ব্যবহার করতে দেওয়া। বাহিরে কুক্রিয়াসক্ত পুরুষ সমাজে বা অশ্লীল উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা নয়।

নারীর স্বাধীনতা নেই বলেই মানুষ তাকে ঘৃণা করতে সাহস পায়। যার স্বাধীনতা নেই তার সম্মানও নেই। সম্মান যে নিজের হাতের মধ্যে---এ জিনিস পরের কাছ থেকে লাভ হয় না। নারীকে নিজের সম্মান নিজে রচনা করতে হবে। চোখ লাল করে তাকে নিজের আসন নিজে পেতে নিতে হবে। যে মহত্ত্ব বা যে সত্য নিজকে প্রতিষ্ঠা করে না তার এ জগতে কোন স্বীকার হয় না---তার মূল্য বেশী নয়। সম্মানের জন্যে মহত্ত্বের এই সংগ্রাম ভদ্র, মধুর ও ধীর হওয়া চাই।

পুরুষের নারীর প্রতি যে একটা আকর্ষণ রয়েছে তাকে অস্বীকার করলে চলবে না। নারী দেখলেই চমকে উঠা, তার সঙ্গে কথা বলা পাপ---তার সঙ্গে প্রেম করা তো মহাপাপ---এ রূপ ধারণা নিতান্তই অন্যায়। প্রেমের সঙ্গে পাপের কোন সংশ্রব নেই,---যেখানে থাকে, তা আদৌ প্রেম নয়। শুদ্ধভাবে নারীর সঙ্গে প্রেম করায় মানুষের জীবন উন্নত হয়। প্রেমিক-প্রেমিকাকে আমরা মোটেই ঘৃণা করতে পারিনে।

যে সত্য করে প্রেম করতে জানে সে মহাপুরুষ। যে শুধু কামনা নিয়ে নারীর সঙ্গে মিলিত হয় সে দরিদ্র। মন যখন নীরস ও শক্ত হয়ে উঠবে; জীবনের অর্ধেক যখন পেরিয়ে গিয়েছে, তখন আর বিয়ে করে লাভ কি?

ইংরেজ কবি শেলী বিয়ে করেছিলেন উনিশ বছরের সময়। মহাকবি সেক্সপীয়ার বিয়ে করেছিলেন মাত্র সতের বছরে।

অল্প বয়সে বিয়ে করলে পড়া মাটি হয়---এ কথা অনেকে বলে থাকেন। বাল্য-বিবাহের কথা বলছি না। যৌবনের প্রারম্ভে বিয়ে করলে চরিত্র খারাপ হবার ভয় থাকে না। বিয়ের পর এক বছর কোন কোন যুবকের পত্নীর সঙ্গ ত্যাগ করা কষ্টকর হতে পারে; কিন্তু নিজের জীবনের উন্নতি অবনতি কিসে হবে; সে কথা বুঝিয়ে দিলে কি যুবক-যুবতীরা বুঝবেন না? যুবকের চরিত্রে বিবাহের পর যদি এরূপ কোন দুর্বলতা আসে তবে অতি সাবধানতার সঙ্গে অতি মিষ্ট ভাষায় দম্পতিকে জীবনের উন্নতি

অবনতির কথা বুঝিয়ে দিতে হবে। এই জায়গায় আরও একটা কথা বলে রাখি, যুবক-যুবতীর প্রেম-চাঞ্চল্যের প্রতি কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা যেন না দেখান হয়। এতে সমূহ বিপদ উপস্থিত হতে পারে। এই বয়সে মানুষের মন বড় চঞ্চল, বড় আবেগময়, বড় পাগল থাকে—সাবধান!

বিয়ের পর কিছুদিনের জন্যে কর্তব্যকার্যে অবহেলা আসতে পারে, কিন্তু সে অবহেলা স্থায়ী হবে না। চরিত্রহীনতার মত মহাবিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কর্তব্যকাজের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে ছেলে বা ছোট ভাই যদি বিবাহিত বালিকা পত্নীর সঙ্গে কিছু সময় নষ্ট করেই থাকে তবে তাতে বিশেষ দুঃখের কোন কারণ নেই।

প্রেমের অর্থ কর্তব্য কাজের প্রতি অবহেলা?

ইতালীয় মহাকবি দান্তের বয়স যখন নয়—তখন তিনি বালিকা বিয়াট্রিসকে ভালবাসেন।

এই ভালবাসা দান্তের সারা জীবনটা স্বর্গে মর্তে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। বিয়াট্রিসের রূপ, তার কথা, তার জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলি পর্যন্ত দান্তের হৃদয় মন পরিপূর্ণ করে ফেলেছিল। বিয়াট্রিসের জন্য তাঁর এই প্রেম তাঁকে অমর করে রেখেছে। আর যতদিন না পৃথিবীর শেষ হয় ততদিন মানুষকে আনন্দ দান করবে।

আমরা কতকগুলি হৃদয় বিনিময়ের কথা জানি।

কবি পিতারার্ক কোন এক গির্জা ঘরে বালিকা লরাকে দেখেছিলেন। এরপর থেকে লরার প্রতি তার এমনি গভীর অনুরাগ জেগেছিল যে তিনি সে জন্যে একেবারে অধীর হয়ে যান। লরাকে আর একটিবার দেখবার জন্যে তিনি কতবার গির্জা ঘরের দুয়ারে এসে ঘুরে বেড়াতেন। হৃদয়-বেদনা কমাবার জন্য তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। লরার যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সেই ভদ্রলোক অনেক সময় লরাকে এত গালি দিতেন যে তাকে সেজন্যে কাঁদতে হতো।

লরাকে ভাল না বাসলে পিতারার্ক এত বড় কবি হতে পারতেন না। লরার মৃত্যু হলে তার স্বামী সে জন্যে কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। পিতারার্ক কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত তার দেবীর সাধনা করেছিলেন। এছাড়া তার জীবনে আর কোন কাজ ছিল না।

কবি ও সাহিত্যিক তাশো এক বড়লোকের মেয়েকে ভালবেসেছিলেন। তার ফলে তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ হতে হয়েছিল। সাত বছর কারাগারে বসে বসেই তাঁর প্রিয়তমার নামে কবিতা রচনা করেছিলেন।

এই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ এক গায়িকার জন্যে পাগল হয়েছিলেন কবি মেতাতাশী। এই চারুহাসিনী খুব বিত্তশালিনী মহিলা ছিলেন। ইনি স্বামীর সঙ্গে যেখানেই বাস করতেন মেতাতাশীও সেখানে থাকতেন--- উদ্দেশ্য তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে তাঁর এ জগতে মিলন না হলেও তিনি তার মুখ দেখেই তৃপ্ত হবেন। এই মহিলা যখন মারা যান তখন তার সমস্ত সম্পত্তি স্বামীর মৃত্যুর পর মেতাতাশীও ভোগ করবেন---এই কথা লিখে দিয়ে যান। বেঁচে থাকতে যার সঙ্গলাভ করবার ভাগ্য মেতাতাশীর হয়নি ; মরে যাওয়ার পর তার সম্পত্তি নিয়ে লাভ কি? কবি এ সম্পত্তি গ্রহণ করেননি।

কেমিওন আঠার বছর বয়সে এক উচচ বংশের নারীকে ভালবাসেন। মর্যাদায় নিজকে প্রিয়তমার সমকক্ষ করবার জন্যে তিনি সৈন্য শ্রেণীতে নাম লেখান। যুদ্ধ করে বীরের কীর্তি অর্জন করে যখন তিনি বাড়ী এলেন, তখন তাঁর প্রণয়িনী মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেন।

স্পেনের বিখ্যাত লেখক সার ডেন্‌টেস এক নারীকে ভালবাসেন। এই নারীর ভালবাসা লাভ করার পর তিনি তাকে ত্যাগ করে অন্য নারীকে বিয়ে করেন।

ওয়েল্যাভের কবিত্ব প্রতিভার কারণ হতাশ প্রণয়। যদি সোফিয়াকে ভালবেসে তিনি প্রত্যাখ্যাত না হতেন তাহলে তাঁর কবি হওয়া হতো না।

ডেনমার্কের কবি ইভাল্ড ছিলেন হতাশ প্রেমিক। প্রণয়ে ব্যর্থ হয়ে অনেক মানুষ বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্যে নিজদিগকে উৎসর্গ করেন। যে মহা আনন্দ হতে বঞ্চিত তাঁরা হন তার আস্বাদ পেতে চান তারা ত্যাগে, সেবায় আর দীন-দুঃখী ও আর্তের জন্য প্রাণপাত করে।

যে প্রেমিক হয়েছে তার হৃদয় যেমন উন্নত ও উদার হয় ; যে প্রেমিক হবার পথে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে ফিরে এসেছে, তার মনও কত বড় হয়ে যায়। প্রেম কত সুন্দর, কত পবিত্র। মানব আত্মার পক্ষে মহা

কল্যাণকর এই প্রেমের সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখে যারা নারীর সঙ্গে মিলিত হন তারা কত বড় হতভাগ্য।

পথের পাশে পতিতা রমণীর সাজসজ্জা দেখে মনে তরল ভাব আসে। যে ঐশ্বর্য নিয়ে নারী এ জগতে এসেছিল মানুষকে প্রেমের স্পর্শে মহৎ করে দিতে, তা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি। কি শোক ও দুঃখের কথা।

নারীর রূপের চরম সার্থকতা বিশেষ কোন ব্যক্তিকে ভালবেসে এবং বিশেষ কোন মানুষের ভালবাসা পেয়ে। ফরাসী দেশে এক সময় এমন একটি অবস্থা হয়েছিল যে, মানুষ নারীকে শুধু ভোগের সামগ্রী মনে করতো। নারী-পুরুষ নিজেদের দুর্বলতা গোপনের জন্যে বিয়ে করতো। নারী-সৌন্দর্যের এর চেয়ে অপব্যবহার আর কি হতে পারে?

জগতের অনেক প্রতিভাশালী ব্যক্তি নারীর রূপের দারুণ অপব্যবহার করে গিয়েছেন---তা ভেবে মনে আমাদের খুবই দুঃখ হয়।

যে নারীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে না পার, যার রূপের প্রতি মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বাসী না হয়ে থাকতে পার, সে রূপকে স্পর্শ করবার অধিকার তোমার নেই।

যুবক বয়সে অনেক সময় মতিভ্রম উপস্থিত হয়। অপদার্থ হীনস্বভাব নারীর রূপ দেখে মুগ্ধ হবার পূর্বে খুব সতর্ক হওয়া চাই, কারণ রূপকে অতিক্রম করে যখন তার ভিতরের সঙ্গে তুমি পরিচিত হবে তখন মন তোমার বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, জীবনে শান্তি থাকবে না---যেমন নারীই হোক একবার বিয়ে করলে তার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুতেই তাকে ত্যাগ করা যায় না।

কবি গোল্ডস্মিথের এই প্রকার একবার মতিভ্রম উপস্থিত হয়েছিল। তার বন্ধুরা কোন রকমে তাঁকে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

যারা নারীর বাহির নিয়ে শুধু ডুবে থাকতে চায় তাদের কাছে নারীর ভিতরের রূপ দরকার না হতে পারে। ভিতরের মাধুরীকে বাদ দিয়ে যে পুরুষ হীন রমনী-রূপে ডুবে যেতে চায় তাকে খুব ছোট বলেই মনে হয়।

মানুষ প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়—সে যে নারী-পুরুষের গভীর অনুরাগের জমান মূর্তি। প্রেমের মূর্তরূপে মানব-শিশুকে জন্ম দিবার জন্যে

খোদা নারী-পুরুষের মাঝে এত অনুরাগ, এত আকর্ষণ দিয়েছেন। এই শুভ উদ্দেশ্যের কথা ভুলে নারীর রূপ ভোগ করবার জন্যে মানুষ ব্যস্ত। বিধাতার দানের কি পৈশাচিক অপব্যবহার।

কবি কাউপার চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন। প্রথমে তাঁর বোন সম্পর্কীয়া থিওডোরার সঙ্গে তার প্রণয় জন্মে। তার মাথা খারাপ হয়েছে সন্দেহ করে পরে থিওডোরার সঙ্গে কাউপারের বিয়ে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। দু'জনাই চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন।

চার্লস ল্যাম্ব তার পাগলী বোনকে রেখে কোন নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেননি। সারাজীবন বোনের সেবা-যত্ন করেই তিনি আনন্দ লাভ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

ফরাসী কবি বেরেঞ্জার এক ইংরেজ বালিকার প্রেমে পড়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠেছিলেন। এক বন্ধু তার এই শোচনীয় অবস্থা দেখে তাকে এক নির্জন পাহাড়তলীতে নিয়ে সেখানে কিছুদিন বাস করেন। পাহাড়ের উদার গম্ভীর দৃশ্য দেখতে দেখতে কবির হৃদয়-ক্ষত অনেকটা শুকিয়ে উঠে।

বিয়ের আগে অনেক সময় সুযোগ হলে যুবক-যুবতীর মাঝে যথেষ্ট প্রণয় সঞ্চার হয় কিন্তু শেষকালে বিয়ে হবার পর সে প্রেম যদি টেকসই হয় তবেই জানা যায় সে প্রেম সত্য।

এক ভদ্রলোক এক বালিকার প্রেমে পড়ে প্রায় উদাসী হয়ে জীবন কাটাতেন। বালিকার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছিল। ভদ্রলোক কত আঁখিজলে এই বালিকাটির কাছে গোপন পত্র লিখতেন। শেষকালে একদিন বালিকা বিধবা হলেন। পুরাতন প্রণয়ী তখন খোদাকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে তার জীবনের পথহারা কুসুমকে আপনার করে নিলেন। আশ্চর্যের বিষয় কিছুকাল পরে এই প্রেমিকপ্রভু তার প্রণয়িনীকে ফেলে হাটে বাজারে জঘন্য স্থানে মাতলামি করে বেড়াতে শুরু করলেন।

প্রেম সত্য কি না, এটা বিশেষ করে জেনে নিয়ে নারীকে স্বামী গ্রহণ করতে হবে; নইলে জীবনে অনেক বিপদ হয়। কত সরলা যুবতী ও বালিকাকে দুষ্ট লোকে বাড়ীর বের করে, ফাঁকি দিয়ে অন্যত্র বিক্রি করে যায়;—সে সব কাহিনী শুনলে শরীর শিউরে ওঠে।

বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়ের প্রতি গভীর সহানুভূতি পোষণ করবেন; তাহলে দাম্পত্য জীবন ভারী সুখময় হবে। সহানুভূতিতে নিতান্ত অপরিচিতদের মধ্যে যে প্রণয় হয়, তা স্বামী-পত্নীতে হবে না, একি সম্ভব? স্বামী-স্ত্রী কেউ কারো প্রতি কোন প্রকার অশ্রদ্ধাপূর্ণ কথা বা ব্যবহার জানাবে না।

দূরদেশ থেকে নিশার আঁধার, বৃষ্টি বিদ্যুৎ মাথায় নিয়ে স্বামী বাড়ীতে আসেন; কার মায়ায়? বাড়ীর মায়ায় নিশ্চয়ই। আর সেই বাড়ীরও প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তার পত্নী। পত্নীর কাছে যদি যত্ন ও ভালবাসা না পাওয়া যায়, সে কি কম দুঃখের কথা? একটা অশ্রদ্ধাপূর্ণ কথা, একটা অবজ্ঞাভরা ব্যবহার প্রাণে কত বাজে? বাড়ী হবে শান্তি ও পুণ্যের কেন্দ্র। সেখানে যে আসবে, তারই প্রাণ শান্তি ও পবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। কোন কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তির বিবাহিত জীবন মোটেই সুখময় হয়নি। পারস্যের মহাকবি সাদী ও গ্রীসের দার্শনিক সক্রেটিস পত্নী নির্বাচনে বিশেষ সুখী হতে পারেননি।

রাজনীতিবিশারদ বার্লের পত্নী ছিলেন বড় ভাল। তার মৃত্যুতে বার্লে দুঃখ করে সদাই বলতেন,---আমার পত্নীর মত সতী সাধ্বী রমণী জগতে অতি অল্প আছে।

কবি ম্যাসন এক খানা-মজলিশে এক নারীকে লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি সারা সন্ধ্যা কারো সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। এই কারণেই কবির মন এই নারীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে উঠলো। শেষে তিনি একে বিয়ে করেছিলেন। ম্যাসনের জীবনও হয়েছিল সুখময়। বস্তুতঃ এক একটা বিশেষ বিশেষ গুণ বিশেষ বিশেষ মানুষকে মুগ্ধ করে। সে গুণ হয়তো সকলের কাছে বিশেষ প্রীতিপ্রদ নয়।

ব্যস্তবাগীশ ক্যালভিন (Calvin) প্রেম, ভালবাসা বা নারী-সঙ্গের জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতেন না। এক বন্ধুকে একটা বউ খুঁজে দেবার জন্য তিনি একবার বলেছিলেন। বন্ধু কিছুদিন চেষ্টা করেছিলেন বটে কিন্তু কাজটা নিতান্ত অসম্ভব ভেবে চেষ্টায় শেষে ক্ষান্ত দিয়েছিলেন।

মার্টিন বোসার এক দশ-ছেলের মা বুড়ীকে বিয়ে করেন। আশ্চর্যের বিষয় এতে তার কিছুমাত্র অসুবিধা হয়নি। বেশ সুখেই তিনি জীবন

কাটিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে পুরুষের যেমন দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে নারীর সেরূপ নেই। শিক্ষা ও শক্তিহীন নারী তার দাবী অনুযায়ী কাজ করতে শরমে মরে যান।

এক বিখ্যাত চিকিৎসক একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর সামনে হঠাৎ একটি যুবতী স্ত্রীলোক মূছিতা হয়ে পড়ে যান। চিকিৎসক যত্ন করে যখন তার জ্ঞান সঞ্চার করলেন তখন স্ত্রীলোকটির প্রতি তাঁর একটা দয়ার সঞ্চার হলো। শেষকালে তিনি তাকে একেবারে বিয়ে করে ফেললেন। দৈব ঘটনায়ও নারী-পুরুষে অনেক সময় প্রেমের সঞ্চার করে।

চিকিৎসক হাণ্টার (Hunter) এক বালিকাকে ভালবাসেন, কিন্তু আয় ভাল হচ্ছিল না বলে তখন তাকে বিয়ে করতে পারেননি। প্রণয়িনীর কথা মনে করে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে মন দিয়েছিলেন। শেষে যখন অবস্থা ফিরলো তখন তিনি বিয়ে করলেন। কবি ক্রেব দীর্ঘ আট বছর তাঁর প্রণয়িনীর অপেক্ষায় কত না কষ্ট কত না আশা-শঙ্কায় কাটিয়েছিলেন।

দরিদ্র ক্রেব প্রথমে চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন; সুবিধা হলো না দেখে বই লিখে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করলেন। এতেও সুবিধা হলো না দেখে তিনি ধর্ম-যাজকের কাজে ঢুকলেন। এই সময় তাঁর একখানা বই বাজারে দাঁড়িয়ে গেল। অবস্থাও তাঁর ভাল হলো এবং তিনি জীবনের আনন্দ প্রতিমাকে এতকাল পরে ঘরে আনতে পারলেন।

প্রণয়িনীকে লাভ করবার আশায় কত মানুষ কত কঠোর সাধনা করেছেন। চিত্রকর রিবলত্ তাঁর শিক্ষকের মেয়ের সঙ্গে প্রেমে পড়েন। একটা অপদার্থ মূল্যহীন যুবক বলে গালি খেয়ে তিনি ইতালীতে পালিয়ে যান। সেখানে বহু সাধনা করে তিনি একজন বিখ্যাত চিত্রকর হতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর এই সফলতার মূলে ছিল একটা বালিকার মুখ। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে শেষকালে শিক্ষক মহাশয় রিবলতের হাতে কন্যা দান করেছিলেন।

এক নারী লেখিকা একখানি ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখেছিলেন। একখানা বড় কাগজে পুস্তকখানির বেশ একটু গরম সমালোচনা হয়েছিল। লেখিকা সমালোচকের ঠিকানা পাবার জন্যে সম্পাদককে পত্র লিখলেন। তারপর

ঠিকানা পেয়ে এই সমালোচক ভদ্রলোকের সঙ্গে কোন কোন বিষয় নিয়ে তাঁর পত্র ব্যবহার হতে লাগলো। শেষকালে দু'জনার মধ্যে একটা প্রীতির ভাব দেখা দিলে উভয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেলেন।

ডাক্তার ডোনে গোপনে সার জর্জের মেয়েকে বিয়ে করেন। এর ফলে তাঁকে ভয়ানক কষ্টে পড়তে হয়েছিল। তিনি যেখানে চাকরি করতেন সেখানে জর্জের মেয়ে বেড়াতে আসতেন এবং উভয়ের মাঝে আলাপ হতো। জর্জ মেয়েকে সন্দেহ করে তখন-তখন অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেললেন কিন্তু এর আগেই ডাক্তার ও তাঁর মেয়ের মাঝে এতটা প্রণয় সঞ্চার হয়েছিল যা চেপে রাখা দু'জনার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছিল। গোপনে তাঁরা এক গির্জায় যেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। জর্জ জানতে পেরে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে জামাইকে চাকুরি হতে ডিসমিস করলেন। যেদিন পাদরী তাঁদের বিয়ের মন্ত্র পড়িয়েছিলেন সেদিন তাঁদেরকে জেলে দিলেন। শেষকালে যখন জানতে পারলেন তাঁর জামাই সামান্য লোক নন, তখন তাঁর ক্রোধ জল হয়ে গেল। প্রতিভাশালী পণ্ডিত ডোনের পত্নী স্বামীকে বড় ভালবাসতেন। ডোনের জীবন বড় সুখময় হয়েছিল।

গণিতবেত্তা সিমসনের ঘরবাড়ী ছিল না। একটু আশ্রয়ের জন্যে তাঁর চেয়ে ত্রিশ বছরের বড় এক দর্জির বউকে তিনি বিয়ে করেন। এই মহিলার দুই ছেলে ছিল। বউটি সিমসনের চেয়ে বয়সে বড়। আশ্চর্যের বিষয় বিয়ের পর এদের মধ্যে কোন প্রকার অশান্তির উদ্রেক হয়নি। উভয়ে বেশ সুখে জীবন কাটিয়েছিলেন। এই সময় মহাপণ্ডিত জনসনও এক আশ্চর্য বিয়ে করেন। এক মাতাল অসভ্য হাবসীর মত চেহারা বুড়ির প্রেমে তিনি পাগল হন। জনসনের বয়সী দুটি ছেলেকে নিয়ে রমণী তার পণ্ডিত প্রেমিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। জনসন এ জন্যে কোন দিন অনুতাপ করেননি; প্রশংসা ছাড়া কোনদিন পত্নীর নিন্দা করেননি। সাহিত্যিক জন উজলীর পত্নী ছিলেন ভয়ানক প্রকৃতির মহিলা। যেমন মুখরা তেমনি বদমেজাজী। তিনি কখনও কখনও স্বামীকে ধরে মার দিতেন। ধীর শান্ত উজলী সে জন্যে কিছুমাত্র বিরক্তি

প্রকাশ করতেন না। কোন নারী কোন প্রেমপত্র লিখেছে কি না গোপনে গোপনে তা জানবার জন্যে স্বামীর পকেট খোঁজ করতেন। এই মহিলাটির হাতে অনেক টাকা কড়ি ছিল। তারই জোরে হয়তো তিনি স্বামীকে এতটা নাকাল করতেন।

দার্শনিক কমতির জীবনে কোন সুখ ছিল না। মুখরা পত্নীর জ্বালায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। শেষকালে একদিন তাঁর পত্নী ক্রোধে তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

তারপর কমতি এক ভদ্র মহিলাকে ভালবাসতে আরম্ভ করলেন। এই ভালবাসার সঙ্গে কোন স্পর্শ-লিপ্সা ছিল না। ভদ্র মহিলার স্বামী কোন অপরাধে জীবনের জন্যে নির্বাসিত হয়েছিলেন। সেই মহিলার মৃত্যুতে কমতি তার কবরের পানে চেয়ে অশ্রু বিসর্জন করতেন। সঙ্গীত-শাস্ত্রে পণ্ডিত ওয়েবারের পত্নী ছিলেন বড় ভাল। গান গেয়ে গেয়ে ওয়েবারকে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হতো। পত্নীকে নিয়ে আমোদ করবার সময় তাঁর হতো না। পত্নী ছিলেন ইংরেজ মহিলা, তার স্বামী ওয়েবার ছিলেন জার্মানী। স্বামীর কাছে ইনি যে সব পত্র লিখতেন তাতে কত উৎসাহ, কত ভালবাসা মাখান থাকতো। ওয়েবারও তাঁর পত্নীকে খুব শ্রদ্ধা-আদর করতেন।

কবি রেশাইন তাঁর পত্নীকে নিয়ে খুব সুখের জীবন কাটিয়েছেন। এঁর সাহিত্য-প্রতিভা সম্বন্ধে পত্নী কোনই খবর রাখতেন না। একবার একখানা বই লিখে রাজার কাছ থেকে রেশাইন দশ হাজার টাকা পুরস্কার পান। মনের আনন্দে পত্নীকে খবর দেবার জন্য দৌড়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করে বললেন,—'ওগো আমার জীবনের আলোক; আজ আমাদের আনন্দ করবার দিন। রাজা আমার প্রতিভাকে সম্মান করেছেন; আর এই টাকা দিয়েছেন। এ আনন্দ শুধু আমার নয়; তোমারও এতে অংশ রয়েছে।' কবি-প্রিয়া সে কথায় আদৌ কান না দিয়ে ছেলেরা কি নিয়ে কলহ করছিল তাই বলা আরম্ভ করলেন। রেশাইন পত্নীর হাত ধরে বললেন,—'আজ ও সব কথা থাক, স্বামীর সম্মানে আজ তুমি আনন্দ কর।'

জন রিচারকে একজন ভাগ্যবান পুরুষ বলতে হবে। তাঁর লেখার মধ্যে নারী-চিত্তকে গলিয়ে দেবার মত এমন একটা প্রভাব থাকতো যা

পড়লে তাঁর প্রতি নারীদের একটা মমতা না হয়ে পারতো না। যে মহিলা বা বালিকা তাঁর লেখা পড়তেন রিচারের প্রতি তারই একটা অনুরাগের সঞ্চার হতো। একটা বিপদ আর কি! লেখা বের হলে দেশশুদ্ধ নারী গোপনে গোপনে তাঁর কাছে অনুরাগের পত্র লিখতেন। যখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ এবং তিনি ছেলেমেয়ের বাপ তখন এক সতের বছরের বালিকা তাঁর অনুরাগে একেবারে ক্ষেপে উঠলেন। শেষকালে প্রতিদানের কোন আশা না দেখে বালিকা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন ;—কি দুঃখের কথা।

বাগ্মী শেরিডন কুমারী লিনলেকে নিয়ে পালিয়ে যান। ভাগ্য, তাকে শেষে বিয়ে করেছিলেন, নইলে বালিকাটির মাথায় কি কলঙ্কই না চাপতো। তখন শেরিডনের বয়স মাত্র বাইশ।

দুঃখ অভাবের চাপে পড়ে তিনি প্রথমে বই লেখা আরম্ভ করেন। দেনাদারেরা অনেক সময় তাঁর ঘরের দুয়ারে এসে হল্লা করত। বিখ্যাত বাগ্মী শেরিডনের কথা সবাই জানেন। তাঁর পারিবারিক জীবন কি ভাবে কাটত তা বোধ হয় অনেকে জানেন না। তাঁর পারিবারিক দুঃখ-ক্লেশ যথেষ্ট থাকলেও সে জন্যে তিনি কিছুমাত্র ম্রিয়মান হতেন না। পত্নী লিনলের ব্যবহার, তার সতী হৃদয়ের অসীম ভালবাসা শেরিডনকে পরিপূর্ণ আনন্দে সকল চিন্তা, সকল ভাবনা থেকে বাঁচিয়ে রাখতো। লিনলের মৃত্যুতে শেরিডন বালকের ন্যায় যখন তখন অশ্রু বিসর্জন করতেন। তিনি বড় বাগ্মী হয়েছিলেন। তাঁর যশ-কীর্তিতে দেশ ভরে উঠেছিল, কিন্তু লিনলের শোক তাঁকে অধীর করে তুলেছিল। কয়েক বৎসর পরে আবার বিয়ে করেছিলেন। পুত্র পত্নী ও তাঁর জীবনকে সুখময় করে তোলার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তবে শেরিডন জীবনে সুখ করতে পারেননি। আয় ব্যয়ের কোনই হিসাব থাকতো না। দুর্বহ জীবনের টান সহ্য করতে না পেরে পত্নীর সেবা-যত্নের মাঝে তিনি শেষকালে প্রাণত্যাগ করেন।

স্টিলের অবস্থাও অনেকটা শেরিডনের মতই ছিল। পাওনাদারদের ভয়ে তিনি অনেক সময় বাড়ী হতে পালিয়ে কাফিখানায় আড্ডা দিতেন। সেখানে তাঁর আনন্দ উচ্ছ্বাসের সীমা থাকতো না। পাওনাদাররা বাড়ীতে

পত্নীর কাছে এসে রিক্ত হস্তে ফিরে যেতে বাধ্য হতো। প্রাণে নানা দুঃখ অশান্তি থাকলেও পত্নীর সামনে স্টিলের মুখে সদাই হাসি লেগে থাকতো। পত্নীর সদ্ব্যবহার, আদর-ভালবাসা তাঁকে দুঃখ অশান্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতো। স্টিল বলতেন,—আমার পত্নী হচ্ছেন বেহেস্তের হুরী, তার স্নেহে জীবনের ব্যথা দূর হয়ে যায়। এরূপ পত্নী যার ভাগ্যে জুটেছে; তার আর কিছুরই দরকার নেই।

কবিদের সঙ্গে বিয়ে জুড়তে নারীদের সর্বদাই সতর্ক হওয়া চাই। কারণ এদের সৌন্দর্য-জ্ঞান অতি প্রবল। এই প্রকৃতির দল কোন্ সময় যে কি করে বসে তা বলা কঠিন। কবি-জীবন সম্বন্ধে এই অপ্রিয় কথাগুলি খুব দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে। তারা অনেক সময় এমন কতকগুলি অন্যায় করে বসেন যার আঘাত সহ্য করা সরলা নারীদের পক্ষে খুব কঠিন। মিলটনের দাম্পত্য জীবন খুব বিশ্রী। অনেক নারীকেই ঘোল খেয়ে তাঁর কাছ থেকে পোটলা বেঁধে বিদায় নিতে হয়েছে। চার্চিল সতের বছরের সময় বিয়ে করেন। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে মনের দুঃখে বিষ খেয়ে মরেন। কবি শেলীর বউ স্বামীর হৃদয়হীন ব্যবহারে জলে ডুবে প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন। সকল কবির দাম্পত্য জীবনই যে খুব অশান্তিপূর্ণ ও নিরানন্দময় তা বলা যায় না। সার ওয়ালটার স্কট, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ বেশ সুখে পত্নীর সঙ্গে ঘর করে গিয়েছেন।

এক মায়ের পেটের তিন বোনকে বিয়ে করেছিলেন কবি সাদী, কোলরিজ এবং লভেল। সাদী বড় ভাল মানুষ ছিলেন। তার দুই কবি বন্ধুর পত্নীরই ভরণ-পোষণ করতে হতো তাঁকে। কোলরিজ ছিলেন বেপরোয়া। পত্নীকে সাদীর ঘাড়ে ফেলে রেখে তিনি নিরুদ্দেশ হলেন। কয়েকটা ছেলেমেয়ে রেখে লভেল মারা গেলেন। সাদী তাদের সকলকে পরিবারের মতই টেনে নিয়েছিলেন। মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সকল ব্যয়ভার নিজে বহন করেছিলেন। সাদীর দ্বিতীয় পত্নী সাদীর মতই একজন খুব ভাল কবি ছিলেন।

টমাস উডের পত্নী মায়ের স্নেহে স্বামীকে যত্ন করতেন। স্বামীর রোগ-শয্যার পাশে কত বিনিদ্র রজনী কতদিন তিনি কাটিয়ে দিতেন। কতক-গুলি স্বামী আছেন যাঁদের মেয়েরা প্রাণ দিয়ে ভালবাসলেও প্রতিদান পায় না।

রোগশয্যায় ব্যাধিযন্ত্রণায় যে পত্নী কত আঁখিজলে স্বামীকে সেবা করেছে, কত গভীর নিশায় উঠে স্বামীর মঙ্গলের জন্যে আল্লার কাছে প্রার্থনা করেছে, সেই স্বামী যখন ভাল হন তখন পত্নীর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক, রূঢ় ও কর্কশ ব্যবহার করতে লজ্জা বোধ করেন না। পত্নীর গুণ তার নজরে আসে না, আসে কেবল দোষগুলি। নিজের চরিত্রে কি কোন দোষ থাকে না যে পরের দোষকে ধরি? শুধু দোষ ধরে কোনকালে কারো চরিত্র ভাল করা যায় না। ভুলগুলি উপেক্ষা করে সদ্ব্যবহার ও জ্ঞানপূর্ণ কথার দ্বারা মানুষকে ভাল করতে হবে। মানুষকে বড় করবার এক প্রধান পথ তাকে পুস্তকের সঙ্গে পরিচিত করে দেওয়া। বিপদকালে পত্নীর সেবা-যত্ন গ্রহণ করা আর পরে তাকে ব্যথা দেওয়া বড়ই অন্যায়। যে বিদ্রোহী হতে পারে না, নিজকে রক্ষা করবার যার অধিকার নেই; তাকে ব্যথা দেওয়া নিতান্তই কাপুরুষতা। শক্তি ও অর্থ আছে বলে পত্নীকে অপমান করা মহাপাপ।

উড তাঁর পত্নীর কাছে নিয়ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলতেন,—তুমি আমার জীবনের শান্তি। তোমার মঙ্গল প্রভাবে আমার জীবন ধন্য হয়েছে। সে কথা শুনে পত্নী আনন্দিতা হতেন।

পত্নীকে ভাল হবার জন্যে উপদেশ দিলে চলবে না। পুরুষেরা যদি নিজেদের স্বভাব ও ব্যবহারগুলিকে সুন্দর না করেন তাহলে শুধু নারীকে ভাল হবার জন্যে যতই কোন কথা বলা হোক না কেন, কোন কাজ হবে না। যত আঘাত করবে মানব-আত্মা ততই বিদ্রোহী হবে। হীন নর-পিশাচের স্পর্শে এলে অতি ভাল লোকও জঘন্য প্রকৃতির হয়ে উঠেন। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে যদি প্রেম ও শ্রদ্ধা করেন; তাহলে মানুষের জীবন কত সুখময় হয়।

প্রেমের কথা না ভেবে শুধু বয়সের খোরাক জোগাবার জন্যে যে বিয়ে হয়, তা হয় বড় নিকৃষ্ট। প্রেমের স্পর্শে নারী পুরুষের মিলন জগতে স্বর্গ রচনা করে। প্রেম মানুষকে নীচ ও দীন জীবন হতে বহু উর্ধ্বে নিয়ে যায়, তার দৃষ্টি হয় কত গভীর, তার হৃদয় হয় কত বিরাট, তার মমতা হয় কত ব্যাপক।

হজরত বলেছেন,—তাকেই বিয়ে করো যাকে তুমি ভালবাসতে পারবে।

শহর ও পল্লী জীবন

পল্লীতে যারা বাস করে, তারা ভাবে—শহরের সবাই বড়লোক, সম্মানী এবং সুখী। বড়লোক শহরে থাকে সত্য, তাদের আয়ও হয় অনেক টাকা, দালানে তারা বাস করে; কিন্তু টাকা থাকলেই যে মানুষ সুখী হয় তা ঠিক বলা যায় না। পাপ ও অন্যায় হতে যে মুক্ত, সেই প্রকৃত সুখী। শহরের অনেক অর্থশালীর মন পাপে ভরা। অনুভূতি নাই বলে তাদের মনে কোন শঙ্কার উদয় না হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত সুখী তাদের বলা যায় না। দস্যু যদি মানুষ খুন করে খুব হাসতে থাকে তাহলে কি তাকে সুখী বলা যায়? পাপ করবার প্রথম অবস্থায় তার মন হয়তো আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু সে তা শোনেনি।

মহামানুষ যাঁরা; তাঁরা মানুষকে একটা কঠিন কথা বলে বেদনায় হয়তো সারা রাত্রি ঘুমান না। আবার যারা নিকৃষ্ট তারা অনবরত অন্যায় করে মহানন্দে জীবন কাটায়। অন্ধের মত তারা নিজেদের সুখী ভাবতে পারে, কিন্তু সত্যি করে তারা মোটেই সুখী নয়।

এক সাধু একটা ভার মাথায় করে একস্থানে যাচ্ছিলেন। অনেক পথ চলে তিনি দেখতে পেলেন; বোঝার উপর একটা পিঁপড়ে ব্যাকুলভাবে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। তাঁর মনে হলো, পিঁপড়েটাকে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তিনি নিয়ে এসেছেন, তাই হৃদয় বেদনায় এদিক ওদিক সে ব্যাকুলভাবে ছুটে বেড়াচ্ছে। সাধু অবিলম্বে ফিরে তাঁর প্রথম যাত্রার স্থানে এলেন এবং বোঝাটাকে মাটিতে নামিয়ে পিঁপড়েটাকে মাটিতে ছেড়ে দিলেন। সাধুর মনে খুব আনন্দ হলো। তাঁর কষ্ট স্বীকারের মাঝে যে একটা আনন্দ রয়েছে সে আনন্দের সন্ধান অত্যাচারী ও বড়লোকেরা সব সময় খুঁজে পাবে না। সাধুর কাজের ভালমন্দ বিচার করতে চাইনে। দেখতে হবে তাঁর মনের সহানুভূতি, ন্যায়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি।

ন্যায় অন্যায়ের কথা না ভেবে বিবেককে হত্যা করে বহু মানুষ অর্থ জমিয়ে বড় লোক হয়। তাদের গৌরবে ও সম্মানে দশদিক মুখরিত হতে থাকে। কত মানুষ তাদের ওষ্ঠের একটু মৃদু হাসির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে, কত দাসদাসী, কত খানসামা, দারোয়ান তাদের সম্মুখে মাথা লুটায়। অফুরন্ত সুখ; অজস্র আনন্দ তাদের চিত্তকে সুখাবেশে মত্ত রাখে; কিন্তু সত্যি কি এরা সুখী? এই অবোধ মানুষগুলির হাসিতে কি গোরস্তানের মৃত্যুগীত ধ্বনিত হয় না? কে তাদেরকে বোঝাবে,—সুখ কোথায়?

এক ভদ্রলোক রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। বয়স তার অনেক হয়েছিল। হঠাৎ একদিন তার মনে হলো, আমি যে বেতন পেয়ে থাকি তার প্রতিদানে ঠিক ওজন মত কাজ দিতে পাচ্ছিনে। এই কথা মনে হওয়া মাত্র তিনি কাজ ত্যাগ করলেন। ঘুষ দিয়ে কাঁদাকাটি করে অনেক মানুষ চাকরি বজায় রাখে; তাদের জীবনে উল্লাস চাঞ্চল্য যথেষ্ট। সে শুধু নিজে সুখী হয় না, তার পত্নী, ভাই, বন্ধু যারাই তার স্পর্শে আসে তাদের মনও আনন্দে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

মনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের জ্ঞান বদলাতে থাকে। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) কে অনেক সুখের উপাদান দেওয়া হয়েছিল; সে সব তিনি গ্রহণ করেননি। তাঁর জীবনের আনন্দ ছিল সত্য ও ন্যায়কে জয়যুক্ত করায়।

শহরের বড় লোকদের মত জীবনকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে না তুলতে পারলে জীবন সার্থক হলো না, এ চিন্তা করা ভুল। মানুষকে নিজের অধীনে আনতে পারাতেও লোক সুখ বোধ করে। মানুষ ভয়ে ভয়ে তোমাকে দেখে দিন কাটাবে; এ সুবিধাটুকু শহরে সম্ভব নয়, শহরের লোক সবাই স্বাধীন; কেউ কাউকে গ্রাহ্য করে না। পল্লীগ্রামে জমিদার এবং কতকগুলি অর্থশালী লোকের পক্ষে মানুষকে পরাধীন ও ভীত শঙ্কিত করে রাখা সম্ভব, শহরে নয়। অসভ্য ও অনুন্নত সমাজে কোন বড় কাজ করবার জন্যে লোকের উপর আধিপত্য প্রয়োজন হয় বটে; কিন্তু শুধু মানুষের উপর সর্দারী উদ্দেশ্যেই মানুষকে অধীন করে রাখা পাপ।

দেশ ও মানুষের কল্যাণের জন্যে সহস্র সহস্র কোটি কোটি টাকার মালিক হতে পার; কিন্তু অনবরত টাকা সংগ্রহ করে লোহার বাক্সে

জমা করায় কি লাভ? মরবার পর অপদার্থ পুত্র-কন্যারা সে টাকা হয়তো পানির মতো উড়িয়ে দেবে।

চরিত্রহীন বড় লোকের ছেলেরা দু'দিনেই লক্ষ টাকা উড়িয়ে দেয়। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। এক উচচ রাজকর্মচারীর ছেলে ছোট-কালে বড় সুখে পালিত হয়েছিলেন। বাল্যে দশজন দাসদাসী তার পেছনে পেছনে হাঁটতো। খোকা যখন যুবক হয়ে উঠলেন তখন বৃথা আমোদ-প্রমোদে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে আরম্ভ করলেন। বন্ধু মহলে তার কত প্রশংসা হলো। শেষকালে পৌঢ় বয়সে তার এত দুঃখ হয়েছিল যে দুই পয়সার মাছের জন্য তাকে দুই মাইল পথ পায়ে হেঁটে যেতে হতো।

টাকা খরচ করতে আমি নিষেধ করিনে, কিন্তু উপায় করবার জন্যেও সাধনা চাই। শহর যেমন খরচের জায়গা; উপায় করবার পথও তেমনি অনন্ত রয়েছে। আমার বাপ একজন বড় রাজকর্মচারী ছিলেন; অতএব কি করে আমি হীন হয়ে টাকা উপায় করবো---এই কথা ভাবলে জীবনের দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। দয়াভিক্ষা না করে বা পরের গোলামি না করে স্বাধীনভাবে পয়সা উপায় করবার জন্যে মনপ্রাণ ঢেলে দাও। লোকে কি বলবে; এই সর্বনেশে চিন্তা মানুষকে শয়তান অপেক্ষাও অধম করে ফেলে। মনের এই সঙ্কোচ-দারিদ্রকে একেবারে চেপে মেরে ফেলতে হবে, নইলে জীবনের চরম অধঃপতন হবে। লোকে যাই বলুক, যা সত্য বলে জেনেছ, তা করতেই হবে। স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তিকে মানুষ কোনকালে কিছু বলে না; লজ্জা সঙ্কোচ আমাদের মনের ভিতর।

কিছু থাক আর না থাক। শহরের মানুষগুলি খুব বাবু ধরনের হয়ে থাকে। নিতান্ত আত্মীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও তারা সালাম করে বাড়ীর বের করে দেয়। পরিষ্কার ও বাবু হয়ে চলাটা দোষের তা বলছিনে। যারা টানাটানি করে জীবন কাটাতে অভ্যস্ত তাদের টানাটানির বোধ হয় কোন কালে শেষ হবে না। খরচ করতে পার, বাবু হয়ে চলাতেও বিশেষ বাধা নেই, কিন্তু চাই তোমার ভিতরের একটা ভীষণ উদ্যম। তোমার শক্তিতে একটা কঠিন বিশ্বাস। সাবধান, জীবনকে উন্নত করবার উদ্যমে যেন কোনও প্রকার কলঙ্ক এসে না জোটে। অন্যকে হত্যা করে নিজেকে

বাঁচাতে তো কোনই আনন্দ নেই। মানুষের সুখ-দুঃখের অনুভূতি সকলেরই এক। অন্যকে বেদনা দিয়ে নিজে কি সুখী হতে পারা যায়?

শহরে বহু বড় বড় ব্যবসায়ী রয়েছেন। এরা ইচ্ছে করলে জাতি ও সমাজের কত কল্যাণ করতে পারেন; তা হয়তো এরা জানেন না। আমেরিকার এক ধনী ব্যবসায়ী গ্রাম্য লোকদের মধ্যে পাঠাগার স্থাপনের জন্যে কোটি কোটি টাকা দান করে গিয়েছেন। কেউ ধর্মপ্রচারের জন্যে, কেউ কুষ্ঠ ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে অজস্র টাকা দিয়েছেন। টাকা পয়সা উপায়ের সার্থকতা কিসে হয় এই কথা যখন বড় লোকেরা বোঝেন, তখনই তাদের টাকা উপায় সার্থক হয়। দীন-দুঃখীর অশ্রু মুছাতে, জাতির কল্যাণ ও জ্ঞানবর্ধন করতে যদি রিক্ত হস্ত হতে হয়; সেও ভাল। টাকা এক জায়গায় জমা করে রেখে কোন লাভ নেই। সেবা-কার্যে যে টাকা ব্যয় না হয়ে মানুষের পাপের ইন্ধন যোগায়, সে টাকা সাগরজলে ফেলে দেওয়াই ঠিক। জঘন্য সে টাকা, তাতে মানব-সংসারের কোনই প্রয়োজন নেই।

শহরের একটা বড় রকমের বেদনা হচ্ছে প্রাণহীনতা, এ জন্যে পল্লীবাসীরা শহরের লোককে অত্যন্ত ঘৃণা করেন। মিথ্যা সম্মান জ্ঞান বজায় রাখবার জন্যে অনেক শহুরে মানুষ অত্যন্ত হীনতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। একবার বাড়ী ভাড়া নেবার জন্যে এক যুবকের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি তার এক আত্মীয়কে আমাদের কাছে চাকর বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করেননি, পরে তার এই অপকর্মের কথা বুঝতে পেরেছিলাম এবং লজ্জায় আমাদের মাথা হেট হয়েছিল। শহরের লোকই এমন রুচির পরিচয় দিতে সাহস পান।

পুণ্যবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের পাশে শহরে এক শ্রেণীর লোক তৈরী হয় যারা অত্যন্ত দুর্মতি। কোন ভদ্র ঘরের ছেলে তাদের স্পর্শে এলে সর্বনাশ হলো। অষ্টাদশ বছরের কম বয়সী কোন যুবককে স্বাধীনভাবে শহরে আসতে দেওয়া ঠিক নয়। এখানে মানুষকে কুপথে নেবার এত প্রলোভন রয়েছে, যার হাত থেকে বেঁচে থাকবার মত মনের বল অনেকেরই নেই। সঙ্গে অভিভাবক থাকলে যুবকদের থিয়েটার ও অন্যান্য বিপজ্জনক স্থান হতে দূরে রাখতে পারেন। অন্য দেশে কি হয় জানিনে; কিন্তু আমাদের

দেশে থিয়েটারগুলি মানুষকে পাপের পথে নেবার জন্য সর্বদা আহ্বান করছে। থিয়েটার দেখলে মনের উন্নতি হতে পারে; এ আমি বিশ্বাস করি না। যদি হয়ই তাহলে সে এদেশে নয়; যেখানে নায়িকারা ভদ্র ঘরের মেয়ে নয়। যারা পথের নারী। চোখে মুখে যাদের সদাই একটা উদ্দাম কামুকতর আকর্ষণ লেগে রয়েছে। এখানে রঙ্গালয় মানুষকে কোন উচ্চ শিক্ষা দিতে পারে না। রঙ্গালয়ের অপবিত্র হাওয়া হতে সর্বদা ছেলেমেয়েদের দূরে রাখতে হবে। অন্ততঃ হিন্দু ভদ্র ঘরের বউ-ঝিরা যদি অভিনয় করেন তা দেখে উপকৃত হওয়া যায়। এই সব চরিত্রহীনা স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে মন কোন উপদেশই নিতে চায় না।

প্রাণহীনতা সম্বন্ধে যে বলছিলাম এটা শহরে বড় বেশী। এখানে ভদ্র ব্যবহারগুলি সাধারণতঃ প্রাণের সঙ্গে যোগ না রেখে হাত মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে। কাজ আর ব্যস্ততায় এখানকার মানুষের উন্নত চিন্তা, হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি চূর্ণ হয়ে যায়। সে জন্যে মনে হয় শহর-বাজারে মানুষের স্থায়ী বাসভবন হওয়া ঠিক নয়। এটা হচ্ছে কেবল কাজের জায়গা; এখানে ভাবের প্রণয় মোটেই নেই। অপরিচিত ও অনাত্মীয় যারা—তাদের সঙ্গে পরের মত ব্যবহার করা যায়; কিন্তু অবস্থায় যদি কুলায় তাহলে আপন লোকের সঙ্গে খুব প্রীতিভরা ব্যবহার করা উচিত। শহর বলেই কি সবাইকে এখানে অমানুষ হতে হবে? অবস্থায় না কুলায় আলাদা কথা; তাই বলে দুটি মিষ্টি কথাও কি দুর্মূল্য?

বহু পণ্ডিত, জ্ঞানী ও উচ্চ শ্রেণীর লোক শহরে এসে জমা হন। এঁদের সঙ্গে মিশলে প্রাণে তৃপ্তি থাকে; মনেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। পণ্ডিত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকের পক্ষে শহরে বাস করা সুবিধাজনক হলেও পল্লীকে তাঁরা ভুলতে পারেন না। ব্যবসা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও স্বাধীন জীবনের অনেক সুবিধা শহরে আছে। এখানে সমস্ত দেশের সুখ-দুঃখ, ন্যায়-অন্যায় ও অভাব-অভিযোগের শেষ মীমাংসা হয়। সারা দেশের অন্যায় ও অবিচারকে ধ্বংস করবার জন্যে এখানে রয়েছে শাসনের মেরুদণ্ড। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মানুষের মিলন হচ্ছে এখানে। শহরের উচ্চ শ্রেণীর লোকদের রুচি, সভ্যতা পল্লীবাসীরা গ্রহণ করেন। শহর দেশের মস্তিষ্ক বলে পল্লীরূপীণী হাত পা-গুলিকে আমরা ঘৃণা করতে পারিনে।

শহরে আর একটা মর্মপীড়ক দৃশ্য সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায়। সেটি হচ্ছেঃ রাস্তার ধারে দুঃখী নরনারীর আর্তনাদ। কোথা হতে এরা আসে তা জানিনে। সবারই বাড়ী যে শহরে, তা নয়। পল্লীতে এদের হয়তো স্থান হয় না, তাই শহরের পাষাণ বুক বিদীর্ণ করে কিছু রস সংগ্রহ করবার জন্যে তারা এখানে আসে। মানুষ থাকতে মানুষের সন্তান ভাত পায় না; এ ভাবতেও আমার মন দুঃখ-বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। গ্রামের দুঃখী আতুরের জন্যে গ্রামবাসীরা কি ব্যবস্থা করতে পারেন, তা পরে বলবো।

শহরের রাস্তার ধারে দেখা যায়, কোন আশি বছরের বুড়ো শীর্ণ দেহখানি প্রখর রৌদ্রের মধ্যে এলিয়ে দিয়ে একটি পয়সার জন্য কাঁদছে। কারো হাত পা খসে পড়েছে, অতি কষ্টে ব্যথিত দেহখানি টেনে নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। কত মানুষ অদেখা অপোছা হয়ে রাস্তায় মরে, কে তার খবর রাখে? স্মরণ রাখবেন—এরা মানুষ, পশু নয়; আমাদের দেশের মানুষ, আমাদের ভাই। কত যে ভিখারিণী দলে দলে দুটি চালের জন্যে দুয়ারে দুয়ারে ঘোরে, তাদের কোলে ছোট ছোট শিশু। কোন নারীর পুরুষের মতই হাত পা খসে পড়েছে। কোথায় এরা রাত্রি কাটায় তাও জানিনে। মুক্ত আকাশ তলে, বৃষ্টি-বাদলায় গাছের তলায় হয়তো এরা বিশ্রাম করে। এদের মধ্যে অনেক যুবতীও আছে, যারা দু'দিন আগে রূপের ঝলকে পথিককে মাতিয়েছিল।

অনেক দিন আগে, একদিন কলকাতায় এক রাস্তায় দেখলাম একটা বালিকা তার শিশু পুত্রকে কোলে করে শীতে কাঁপছে। কাছে যেয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—তোমার বাড়ী কোথায়? সে বললো নদীয়া জেলায়। অনেকক্ষণ কথা বলার পর বুঝতে পারলাম, দু বছর আগে সে কোন যুবকের প্ররোচণায় বাড়ীর বের হয়। যুবকটি তাকে নিরাশ্রয় করে ফেলে পালায়নি, সম্প্রতি কি একটা অন্যায় করে জেলে গিয়েছে। এখন নিরাশ্রয় হয়ে পথে বেরিয়েছে। যেখানে বাস করছিল, বাড়ীর খাজনা না দিতে পারায় তারা তাকে বের করে দিয়েছে। শিশুটির বয়স মাত্র তিন মাস; তার বাপই হচ্ছে সেই লোকটি। কোথায় এর বাড়ী? যখন সে ছোট ছিল কত লোক তাকে সোহাগ করেছে আর আজ সে কোথায়?

স্নেহ নেই, মায়া নেই, আপন বলতে তার এ সংসারে কেউ নেই। তার ঘর দুয়ার, তার পরিচিত খেলার সাথীরা আজ কোথায়? একটুখানি ভুল করায় জীবন ভরে তাকে এক নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হবে। সে যে নারী---তার হৃদয়-বেদনা বোঝবার মত কেউ নেই। এই শ্রেণীর বহু মেয়ে শহরে বাস করে। শয়তান প্রকৃতির লোক যুবতী মেয়েদের চুরি করে এনে শহরে পাপ কাজের জন্যে বিক্রি করে---যারা এককালে ছিল পল্লী পরিবারের শুভ্র ফুলের মালা। আর একটা মেয়ের কথা জানি। এই মেয়েটির বাড়ী হচ্ছে এক পল্লীতে। একটা বুড়ী গঙ্গাস্নানের কথা বলে তাকে কালীঘাটে নিয়ে আসে। বালিকাটি সরল মনেই স্নান করে পুণ্য অর্জন করবার জন্যে রেলে চড়ে শহরে এসেছিল। স্নান শেষ করে যখন সে উপরে উঠলো তখন বহু অণ্বেষণ করেও সে বুড়ীকে খোঁজ করতে পারলো না। তারপর তার জীবনে বহু ঘটনা ঘটেছে। শেষকালে উদরের জ্বালায় ও লজ্জা নিবারণের জন্যে লজ্জা বিক্রয়ের ব্যবসা শুরু করেছে। একে ভদ্র ঘরের মেয়ে বলেই বুঝতে পেরেছি। খোদার উপর তার খুব বিশ্বাস। পাপ জীবনের কথা স্মরণ করে সে বললো,—কপালে লেখা ছিল; কি উপায় আছে আমার; তাই বলুন। কষ্টে আমার মন ভেঙ্গে গিয়েছিল। ইচ্ছা করেছিলাম একটা সেলাই-এর কল কিনে দিয়ে তাকে স্বাধীন ও পবিত্র জীবন যাপনের পথ করে দেবো; কিন্তু সাহিত্যিকের তো পয়সা নেই কেবল বেদনা আছে। মানব-জীবনের এই কঠিন দুরবস্থার কথা যখন মনে হয় তখন খোদাকে বলি, হে খোদা, আমাকে হত্যা করে এদের বাঁচাও, অথবা এদের একটা পথ করে দাও। অত্যাচারী সমাজের বিধানে এইভাবে কত মানুষের জীবন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

আরও একটা পতিতা স্ত্রীলোক আমাকে যা বলেছিল, তা শুনলে আপনারা স্তম্ভিত হবেন। রাস্তার ধার থেকে সে আমাকে এই কথাগুলি বলে আহ্বান কচ্ছিল,--- আপনি আমার মা-বাপ, আমার ঘরে আসুন, আমাকে কিছু দিয়ে যান; নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ ধন আপনাকে দেব তার পরিবর্তে আপনি কি আমাকে কিছু দেবেন না? হায় রে হতভাগিনী, যদি পয়সাই থাকতো তা হলে সর্বস্ব দিয়ে তোমাদের এ পাপজীবন হতে উদ্ধার করতাম।

নদীয়া জেলা হতে মেহের আফজানকে শয়তানেরা কেমন করে চুরি করে এনেছিল, সে খবর সকলেই জানেন। সে ছিল কুলবধূ। শেষকালে তাকে হতে হয়েছিল এসেংসমাখা সাধারণ নারী। কি বিস্ময়! কি বেদনা—যা ভাবতে চোখে পানি আসে। এরূপ বহু ঘটনা নিত্যই ঘটছে। সেদিনও চব্বিশপরগণার একটা মেয়েকে তার 'খালা' মুখ বেঁধে চুরি করে এনে বালীগঞ্জে কুব্যবসার জন্যে বিক্রয় করে। শহরে যে সব পতিতারা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের অনেকের জীবনের প্রথম পৃষ্ঠা যার-পরনাই শোকাবহ। এদের কথা কে ভাবে? চরিত্র হারাবার ভয়ে কলঙ্কের লজ্জায় ভদ্রলোকেরা এদের কাছ থেকে দূরে সরে যান; কিন্তু শিক্ষিতা মহিলারা কি এদের জন্যে কিছু করতে পারেন না?

সকল দেশেই কুস্বভাবা নারী পাপব্যবসা করে। কিন্তু আমাদের দেশের মত অন্নের জন্যে কিংবা সমাজের অত্যাচারে তাদের এ কদর্য জীবন অবলম্বন করতে হয় না। যে শয়তানী সে ধ্বংস হয়ে যাক, তার জন্যে কিছু হয়তো করবার নেই।

অন্যান্য দেশে রাস্তায় আর্ত পীড়িতের জন্যে আশ্রম আছে কি না ঠিক জানিনে। রাস্তায় মানুষ মরতে দেখে কি করে ঘরে দুয়ার দিয়ে শুয়ে থাকা সম্ভব? এদের আঁখিজল, এদের ব্যথা কি চিরদিনই ব্যর্থ হয়ে যাবে?

শহরে যে সব বড় বড় মান্যাস্পদ ব্যক্তিকে দেখা যায় তাদের বাড়ী প্রায়ই শহরে নয়। পল্লীর অজ্ঞাত কুটিরে যিনি এক সময় খেলা করে-ছিলেন; আজ তিনি নগরে উচচ বেদীর উপর দাঁড়িয়ে জাতির কর্তব্য-কথা শোনাচ্ছেন। ভবঘুরে শহরবাসীরা চিরকালই ভবঘুরে। নিজেদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান ভেবে অল্প বয়সে অত্যধিক চালাক হয়ে শহুরে বালকেরা জীবনকে মাটি করে দেয়। পল্লীর শান্ত শীতল নির্জন মাঠ, গোধূলি লগ্নে পশ্চিমাকাশে সোনালী রাগ, নদীতীরে পল্লীবালাদের কলহাসি, পালতোলা নৌকাগুলির অন্তহীন পথে যাত্রা শহরে কারো মনকে ভাবময় করে তোলে না। এখানে কেবল মুহূর্তে মুহূর্তে চিত্রপটের মত দৃশ্য বদলাতে থাকে; মন কোন চিন্তা করবার সুযোগ পায় না। যে হৃদয় নিরালায় বসে মানব-সমাজ তথা বিশ্বের শত লীলা রঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা করবার কিছুমাত্র অবসর পায়

না, তার কি মনুষ্যত্ব থাকে? কলকারখানার মত শহরের লোকগুলি সুশৃঙ্খলায় জীবন কাটায়। কলকারখানার সঙ্গে যেমন ভাব ও প্রাণের কোন যোগ নেই—শহুরে লোকগুলির জীবনও ঠিক তেমনি। নিত্য সকাল বেলা উঠা, কাজের মত করেই কিছুক্ষণ খবরের কাগজ পাঠ করা, তারপর বাঁধা কাজে জীবন শেষ করে দেওয়া। চিন্তা করে বা ভেবে তারা জীবনের সময় নষ্ট করবার সুযোগ পায় না। ভাবপ্রবণ হয়ে শহুরে লোক কাউকে আপন মনে করতে পারে না। স্বার্থ ও টাকার গন্ধ যেখানে পায় সেখানে যেয়েই তারা হাজির হয়। তারা আপন মনে করে কেবল হয়তো পত্নীকে। জগতের আর কারো সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ নেই।

একটা মানুষ মরে গেলে পল্লীর সকল মানুষের চোখ দিয়ে পানি পড়ে। শহরে কি তাই? কে কার খবর রাখে? কারো ব্যাধি হলে তাকে দূর করে দিতে পারলেই শহুরে লোক নিশ্চিন্ত হয়।

পল্লী বালকের স্নেহপ্রবণ ভাব কোনকালে যায় না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাবটি আরও উদার ও ব্যাপক হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে শহুরে লোক যতই বড় হতে থাকে যতই তাকে জীবন সংগ্রামের কঠিন ভাবনা ভাবতে হয়, ততই তার মনের সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বেড়ে ওঠে।

শ্যামল প্রকৃতি-ছায়ার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ শহরবাসীর নেই। দেশের এত খবর, এত রক্তারক্তি, এত ওলট-পালট এ সবের কোনটির সঙ্গে তার সহানুভূতি নেই। সে কেবল নিজের ভাবে মশগুল।

নিরালা নির্জন স্থান জীবনের বা মনের উন্নতির পক্ষে খুবই অনুকূল। মনের উন্নতি না হয়ে শুধু পয়সায় যদি মানুষ বড় হয় তবে সে বড় হওয়ার কোন মূল্য নেই। শহুরে লোকের পক্ষে একাকী হয়ে থাকা একেবারেই অসম্ভব। সহস্র নতুন মুখ সহস্র নতুন চিত্র তার মনকে সর্বদা উত্তেজিত করে রাখে। কোন জিনিসের ভিতরের দিকে তাকাবার তার কোন অবসর নেই।

গ্রামের মাঠে ধানের ক্ষেতের শ্যামল শোভা শহরে নেই। ফসল তৈরী করবার জন্যে পল্লীর মানুষেরা মাঠে যে পরিশ্রম করেন, তাতে কত আনন্দ। কৃষকেরা অশিক্ষিত বলে লোকে তাদের ঘৃণা করে

থাকেন। শিক্ষিত লোকে এই সমস্ত কাজ করলে কেউ তাদের ঘৃণা করতে পারে না।

কি করে ধান তৈরী হয়, দেশের মানুষ কেমন করে ফসল তৈরী করে, পল্লীবাসীরা কেমনভাবে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে। এ বিষয়ে শহুরে লোকের কোনই ধারণা নেই। সুতরাং দেশ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান খুব অসম্পূর্ণ।

বিলেতের অধিকাংশ ইঞ্জিনিয়ার গ্রামের মায়ের ছেলে। নদীর নীচে রেলের রাস্তা তৈরী, বড় বড় সেতু নির্মাণ এ সব শহুরে লোকের দ্বারা হয়নি।

নিউটন, জর্জ স্টিফেনসন বাল্যকালে অজ্ঞাত পল্লীতে মানুষ হয়েছিলেন। পল্লীতে অজ্ঞাত হয়ে অনেক বড় মানুষ জাতির সেবা করে থাকেন। নাম যখন তাঁদের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, পল্লীবাসী যখন সাধনা পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়; তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে শহরে আসেন। সাহিত্যিক বাফুন (Buffon) কিন্তু চিরকালই পল্লীমায়ের আঁচলে বসে জাতির সেবা করেছিলেন। তিনি শহুরে জীবন পছন্দ করতেন না।

জাতিকে যাঁরা শক্তি ও জীবন দান করেছেন; তাঁরা নির্জন পল্লীর বুকে বাস করতেন। ক্রমওয়েল জীবনের চল্লিশ বছর পর্যন্ত গ্রামে ছিলেন। ওয়াশিংটন প্রথমেই দেশনায়ক হননি।

শত শত মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি যিনি পাচ্ছেন। যাঁর চারদিকে কত মানুষ ভীত ব্যাকুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তিনি যে কোনকালে খোকা ছিলেন, মায়ের বুকে কেঁদেছেন; তা বিশ্বাস করতে মন যেন চায় না। অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার মারে (Alexander Murray), রেভারেণ্ড জন ব্রাউন; জ্যোতির্বিদ জেমস ফারগুসন (Furgusan) এঁরা এক সময় মাঠে মাঠে মেষ চরাতেন। গ্রামের সুখ-দুঃখের মাঝে তাঁরা লালিত পালিত হয়েছিলেন; পল্লীপথের মাটি তাঁদের দেহকে এক সময় বিমলিন করেছিল। মধ্যাহ্নে নির্জন মাঠের মাঝ দিয়ে অথবা নদী পথে যাবার সময় প্রাণের মাঝে যে ভাবের উন্মেষ হয় তা শহরে তো অনুভব করতে পারিনে? প্রান্তরের বুক কাঁপিয়ে দিগন্তের বাতাস পথিকের মনে যে সম্পদ আনে, তা

তা শহরে কই? জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃতির পুলক-উৎসব, বর্ষাকালে মেঘের মাতামাতি, ঝিল্লিমুখর নিশীথরাত্রি ; গ্রামপ্রান্তে নারী দুঃখের করুণ প্রতিধ্বনি শহরে নেই। কতদিন নির্জন মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে কত কথা ভেবেছি, কোন দূর জগতের অব্যক্ত আহ্বান এসে প্রাণকে ব্যাকুল করে তুলেছে : শহরে তা কই।

পল্লীর মাঠ-প্রান্তরগুলি মানুষকে চিন্তাশীল করে তোলবার পক্ষে খুব অনুকূল। চিন্তার সঙ্গে যে হৃদয়ের যোগ নেই, সে হৃদয় বড় দরিদ্র। বেঞ্জামিন ব্রডী (Benjamin Brodie) মাঠে মাঠে ঘুরে চিন্তা করতে শিখেছিলেন। নতুন নতুন সত্যের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ; যখন তিনি একাকী পল্লীর পথ ধরে ঘুরে বেড়াতেন।

দেশের গ্রামগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। সেখানে না আছে রাস্তা ; না আছে কোন পাঠাগার। বিদ্যালোচনা ব্যতীত সাধারণ লোকের উন্নতি হবে কিসে? বই না পড়ে কি মানুষ আত্মার দারিদ্র্যে লজ্জিত হয়? সকলেই মুখে বলে, সদা সত্য কথা বলা উচিত ; কিন্তু মনের উপর কথার দাগ ফেলান কি সহজ কথা? মানুষকে কত বিচিত্র পন্থার ভিতর দিয়ে সত্যে দীক্ষিত করতে হবে, তার কি ঠিকানা আছে? লেখক ও সাহিত্যিকেরা কবিতা, গল্প, ইতিহাস ও কাব্যের ভিতর দিয়ে মানুষকে সত্য পথে আহ্বান করছেন। জীবনকে বড় করে তোলবার জন্যে সর্বদা বই পুস্তক পড়তে হবে। সাধারণ মানুষকে উচচ প্রেরণা দেবার জন্যে তাকে জ্ঞান সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে অথচ এ কাজের জন্যে কোন চেষ্টা নেই। জ্ঞানের সেবা না করলে কোন মানুষের বা কোন জাতির দুঃখ ঘোচে না। কলেজ ও স্কুলে ক'টি লোক যেতে পারে? পল্লীতে যারা অজ্ঞাত জীবন-যাপন করছে তাদের দুয়ারে যেয়ে জ্ঞান ও সাহিত্যের উপহার নিয়ে দাঁড়াতে হবে।

মানুষের সহিত মানুষের যোগ হবার সুবিধা গ্রামে খুব কম। মানুষ-গুলি সেখানে কূপমণ্ডূক হয়ে বসে থাকে, এর কারণ রাস্তা-ঘাটের অভাব। কোন চিন্তাশীল লোক গ্রামে যাবার সুবিধা পান না। কোন নতুন কথাও গ্রামের লোক জানতে পারে না। একে সেখানে মোটেই ভাব নেই ; তার উপর যেটুকু আছে, তারও আদান-প্রদানের সুবিধা সেখানে খুব কম।

জাতিকে বড় করতে হলে পল্লীর মানুষকে প্রথমে জাগাতে হবে। গ্রামে গ্রামে পাঠাগার খুলতে হবে; চলাচলের সুবিধা করে দিতে হবে। যারা শিক্ষিত তাদের ঘৃণা অহঙ্কার পরিহার করে পতিত মানুষের জন্যে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। মানুষের জন্যে মানুষের মাথা ব্যথা হওয়াই প্রয়োজন। মানুষকে ভুলে যারা ধর্মজীবনের আদেশগুলি পালন করতে যান, তাদের ধর্ম-পালন কিছুই হয় না। মানুষের জন্যে মানুষকে কাঁদতে হবে।

গ্রামের নিরীহ অধিবাসীদের উপর রাজা জমিদারদের কর্মচারীরা বিলক্ষণ অসদ্ব্যবহার করে থাকেন। সে অসদ্ব্যবহার সহ্য করে ভদ্র ও শিক্ষিত লোকের পক্ষে সেখানে বাস করা কঠিন। রাজকর্মচারীরাও গ্রামবাসীদের প্রতি যথেষ্ট অবিচার করে থাকেন। মানুষকে দলিত ও লাঞ্ছিত করতে পারলেই যেন তাদের মনে আনন্দ হয়। সেখানে সবলেরা সর্বদা দুর্বলের রক্ত চুষে খাওয়াতেই জীবনের সার্থকতা অনুভব করেন।

গ্রামে নারীদের যে দুর্দশা হয়, তা আর বলে কি হবে? পল্লী-নরনারীর দুঃখ-বেদনা বোঝবার জন্যে কার মাথা ব্যথা হবে?

ডাক্তার আরনল্ডের পল্লীজীবনের প্রতি একটা আন্তরিক টান ছিল। তিনি ছেলেদের নিয়ে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতেন। পল্লীর লতাপাতা, শ্যামল মাঠ, উঁচু গাছগুলি তাঁর প্রাণে আনন্দের ধারা ঢেলে দিত। প্রকৃতির মাঝেই তো আমরা জীবনের সন্ধান পাই—অনন্তের সঙ্গীত শুনি। হৃদয় যাদের বড় তারা প্রকৃতির শ্যামল মাধুরীর ভিতর থেকে জীবনের হাজার সম্পদ কুড়িয়ে নেন। কি হবে ইট পাথরে, দালানে, অর্থের কাঁড়ি দিয়ে? চাই শান্তি, পাপের পরাজয়, মানব দুঃখের অবসান আর আত্মার পুলক।

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পল্লীমায়ের আদুরে সন্তান। মৃত্যু পর্যন্ত জগতকে তিনি প্রকৃতি জননীর সঙ্গীত শুনিয়েছেন। মানুষ বিহ্বল হয়ে কবির সে গান শুনেছে আর চিরকাল শুনতে থাকবে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বীণা-ধ্বনি নীরব হবার নয়।

সিডনী স্মীথ (Sydeny Smith) গ্রামে বাস করেই এডিনবরা রিভিউয়ের জন্যে প্রবন্ধ লিখতেন। সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মাঠের কাজে

ব্যস্ত থাকতেন। শেষ জীবনে শহরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন; কিন্তু গ্রাম্য-জীবনের আনন্দ ও তৃপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছিলেন বলে তিনি অনেক সময় দুঃখ করতেন।

দার্শনিক টমাস কার্লাইল পল্লীর অজ্ঞাত কুটিরে জন্মেছিলেন। তিনি জগৎকে যে চিন্তা সম্পদ দিয়ে গিয়েছিলেন; তার মূল হচ্ছে বাল্যকালের তাঁর সেই নির্জন পল্লীবাস। লেখাপড়ার জন্যে তিনি কিছুদিন এডিনবরা শহরে গিয়েছিলেন। বিয়ের পর হতেই তিনি পুনরায় পত্নীকে নিয়ে এমন নিরালা নিভৃত স্থানে বাস করতেন যে, সেখানে যেতে হলে অপরিচিত লোককে বিলক্ষণ বেগ পেতে হতো। আমেরিকার পণ্ডিত এমার্সনকে (Emerson) বহু কষ্ট করে গ্রামের মাঝে যেয়ে তাঁকে খুঁজে বের করতে হয়েছিল। কার্লাইল নিতান্তই একা একা বাস করতেন। তাঁর বাড়ীর কাছে একটা জনপ্রাণী ছিল না, যার সঙ্গে প্রাণ খুলে তিনি একটু কথা বলতে পারেন। কাছে একটা পাদরী ছিলেন মাত্র, তাঁর সঙ্গে তাঁর আলাপ হতো। অবশিষ্ট সময় পত্নীর সঙ্গে আলাপ করে আর বই পড়ে তিনি কাটাতেন।

দেশে মন টেকে না—এ কথা অনেককেই বলতে শুনেছি। গ্রামের লোকগুলি অসভ্য ও নীচাশয়। রাস্তা-ঘাটগুলি কর্দমাক্ত—এ সমস্ত কথাও অনেকে বলে থাকেন। পল্লীকে ঘৃণা করে তারা বন্ধু-বান্ধবের কাছে প্রশংসা লাভ করতে চান; এটা ঠিক নয়। পল্লী যদি জঘন্য স্থানই হয় তবে তাকে বড় করে নিতে হবে। গ্রামের লোকগুলি যদি দুর্মতিই হয়, তবে তাদের ভাল করতে হবে; এতেই তো জীবনের বিশেষত্ব। কাপুরুষের মত দেশ ছেড়ে নিজের সুখ ও উন্নত মনটি নিয়ে পালিয়ে এলে চলবে না।

মন উন্নত হয়ে লাভ কি? যদি না মন অন্য মানুষকে উন্নত করতে পারে? জগতের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য এই ধরনের উন্নত মন দিয়ে পৃথিবীর কোন উপকার হয় না।

অনেক জায়গায় দেখেছি; বড় লোকেরা কতকগুলি লোককে বাড়ীর পার্শ্বে দাস করে রাখেন। নিজেদের বড়মানুষেতা অক্ষুণ্ন করে রাখবার জন্যে কতকগুলি মানুষের জীবনকে কি ব্যর্থ করে দিতে হবে? ছোট লোকে

লেখাপড়া শিখলে ভদ্রলোকদের সম্মান থাকবে না, একথা তারা বলে থাকেন। এরা যে কত বড় অমানুষ তা আর বলে কি হবে।

যে অর্থ মানব-কল্যাণে ব্যয়িত হয় না, যে ক্ষমতা মানুষের দাবী রক্ষার জন্যে অর্জিত হয় না ; যে বিদ্যা মানুষকে সত্য ও ন্যায় মহিমা শোনাবার জন্যে লাভ হয় নাই—সে অর্থ, সে ক্ষমতা, সে বিদ্যার কোন মূল্য নেই।

রোমান জাতি সর্বদাই গ্রাম্য লোককে ঘৃণা করতেন। ভদ্রলোক যারা তারা শহরে থাকবে। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকদের জন্যে গ্রাম—এই ছিল তাদের ধারণা এবং জাতীয় প্রথা। মানুষকে যে মানুষ ঘৃণা করে, একজনের দাবী যে আর একজন অপহরণ করে, এর মূলে ঘৃণিত ও অপহৃত ব্যক্তির অনেকখানি দোষ ও দুর্বলতা থাকা সম্ভব ; কিন্তু রোমানেরা যাদের গ্রাম্য ছোটলোক বলে ঘৃণা করতেন শেষকালে তারাই হয়েছিল জাতির চালক।

পল্লীর যে সব মানুষ অবজ্ঞাত হয়ে থাকে, তাদের জাগরণ হয় তখন যখন তারা জ্ঞানের স্পর্শে আসে। যে জাতি বা যে মানুষের মনে দাম্ভিক ও আত্মসর্বস্ব হয়ে তৃপ্তি আসে ; তাদের স্থান খুব নীচে—এটা হচ্ছে পতনের পূর্ব লক্ষণ। অত্যাচারী জাতি বা অত্যাচারী মানুষ ছোটকে জ্ঞানান্ধ ও ছোট করে রাখতে চায়, পাপী ও পতিতকে ঘৃণা করতে আনন্দ বোধ করে। ছোটকে বড় করাই মনুষ্যত্ব ও বড় ধর্ম। এ জগতে যত মহাপুরুষ এসেছেন, তাঁরা দরিদ্র, হীন ও পতিতকে বড় করেই জীবনের দানকে সার্থক করেছেন।

পুস্তকে যা পড়ি তার চেয়ে কাজ হয় বেশী মুখের কথায়। জীবন্ত মানুষের মুখ থেকে যে ভাব ও শব্দ বের হয় ; তা বৈদ্যুতিক শক্তির মত মনের উপর ক্রিয়া করে। পুস্তকও মানুষকে বড় করবার জন্যে নীরবে কাজ করতে থাকে। সাহিত্যের শক্তিও অসাধারণ।

শহরে বাজারে এক শ্রেণীর দুর্মতি লোক দেখা যায় যাদের পতিত আত্মাকে রক্ষা করবার জন্যে কারো বেদনা নেই। জাতিকে শক্তিশালী করতে হলে এদের কানের কাছে বড় কথা ও বড় চিন্তার ধ্বনি তুলতে হবে। মানব-আত্মাকে আঘাতের উপর আঘাত করতে হবে। শাসন-যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে ভাল করবার জন্যে বহু সমিতি থাকা বাঞ্ছনীয়।

পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে, গ্রামে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে ছোট ও দুর্মতি লোকদেরে নিয়ে মনুষ্যত্বের কথা বলতে হবে। বিলেতে পতিত মানুষের উদ্ধারের জন্যে বহু চরিত্রবান নারী-পুরুষ সেবক-সেবিকা আছেন। আমাদের দেশে কি শহরে, কি পল্লীতে এরূপ কোন অনুষ্ঠানই নেই। যে সামান্য শক্তি আছে, তাই নিয়ে,—হে দেশের মানুষ, মানব সেবায় বেরিয়ে পড়। সভ্য জাতির সেবাধর্ম একটা স্বভাব। মানব কল্যাণই তার যাত্রা পথের সাধনা। ছোট, দরিদ্র, হীন, অবজ্ঞাতকে নিয়ে আজ আমাদের পাগল হতে হবে।

খ্রীস্টানকে যতই আমরা ঘৃণা করি, সেবা ধর্মের দিক দিয়ে এঁরা কত বড়। কিছুদিন হলো সার্কুলার রোডে এঁরা একটা নতুন ফ্রী স্কুল খুলেছেন। সেখানে ছোট-বড়, মুটে-মজুর শ্রেণীর ছেলেরা পড়ে। ছেলেদের পড়ার অনেক পুস্তকও সেখানে জমা করা হয়েছে। এরূপ একটা স্কুল নয়; শত শত ফ্রী স্কুল তাঁরা দেশের সর্বত্র খুলেছেন। মানুষকে সত্য পথে, জ্ঞানের পথে আনবার জন্যে ফ্রান্স, আমেরিকা ও বিলেতের বহু মানুষ জীবনের সমস্ত অর্জিত ধন দান করে যান। সে কি দু' একটা টাকা? এই সব টাকা দিয়ে প্রচারকার্য; দীন-আর্তের সেবা, পুস্তক প্রচার প্রভৃতি বহু ভাল কাজ হয়ে থাকে।

আমার একটা পাদরী বন্ধু এক বাঁশ বাগানের ভিতর থেকে একটা ছোট মেয়ে কুড়িয়ে এনেছিলেন। সে যখন সেয়ানা হয়েছিল তখনই তাকে দেখেছি। মানুষের প্রতি তাদের এই যে প্রেম, এ যে শ্রদ্ধার চোখে না দেখে সে মুসলমান নয়। কত নিঃসহায় বালক-বালিকা, কত অনাথিনী, কত কানা-খোঁড়া তাদের আশ্রমে আশ্রয় পায়। আমরা কি মানুষের জন্যে কিছুটা করতে পারিনে? শুধু হৃদয়হীন ধর্মবিশ্বাস কি মানুষকে মুক্তি দেবে? আজ বেদনা নিয়ে শহরে পল্লীতে সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হবে, কথা বলতে হবে, গান গাইতে হবে।

কবি গোল্ডস্মিথের বিখ্যাত বই 'ভিকার অব ওয়েকফিল্ড'-এ গ্রাম্য জীবনের মনোহর ছবি ফুটে উঠেছে। ফিলডিং (Fielding); স্মলেট (Smolet); জর্জ ইলিয়টের (George Eliot) বইগুলি পল্লী-কাহিনীতে ভরা। ওয়াল্টার স্কটের বইগুলিতে পাহাড় পর্বতের বর্ণনা,

উপত্যকা ও গ্রামের সবুজ ক্ষেতগুলির ছবি পড়লে মনে প্রভূত আনন্দের সঞ্চার হয়। সে সব বর্ণনায় কত প্রাণ, কত প্রণয়, কত আশা, কত সুখ-দুঃখের পরশ জড়ানো। পল্লীর পরিত্যক্ত বনভূমি, নির্জন নদীতীর, ভাঙ্গা বাড়ী, রাখাল বালকের সঙ্গীত ধারা ; কবির মনকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল।

কবি বায়রনকে প্রৌঢ় বয়সে শহরে বাস করতে হলেও বাল্যে তিনি পল্লীর সরল শোভার মধ্যেই বেড়ে উঠেছিলেন। মহাকবি সেক্সপীয়ারের কবিতায় গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্য কেমন চিত্রিত হয়ে উঠেছে। পাখীগুলি দিন অবসানে নীড়ে ফিরে আসছে ; ফুলের গাছগুলি সৌন্দর্য পুলকে মানুষের চিত্তকে পুণ্যপবিত্রতায় ভরে তুলেছে। তিনি ছেলেবেলায় ছেলে-মানুষী করে পল্লীবালকদের সঙ্গে এক হরিণ চুরি করেছিলেন। মধ্য জীবনে তিনি লণ্ডনে থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু জীবনের শেষের দিকে পল্লীর শান্ত শীতল কোলে ফিরে গিয়েছিলেন।

সেনস্টোন (Shenstone), কাউলে (Cowly), কাউপার (Cowper), ফিলিপ সিডনী (Philip Syddeny) সবাই গ্রাম থেকে এসেছিলেন। অধ্যাপক বসুর বাড়ী পূর্ববঙ্গে। হেরম্ব মিত্র, পি, সি, রায়—কারো বাড়ী শহরে নয়। কবি মাইকেল ছিলেন যশুরে বাঙ্গালী মায়ের ছেলে। পল্লী প্রকৃতির শ্যাম দোল-লীলার মাঝে কবি সাহিত্যিক নিজেদের ভাবের সাড়া পান। রবীন্দ্রনাথ জীবনের অনেক সময় নদীবিহারে কাটিয়েছেন। ইট পাথরের মধ্যে মানুষের প্রাণের খোরাক নেই ; তা আছে--উদার আকাশে দূর মাঠের পারে, শেষ বিদায়ের অশ্রু সম্ভাষণে, স্রোতস্বিনীর কুলধ্বনিতে, ফুলের শোভানৃত্যে, মুক্তভরা দুর্বা আস্তৃত গ্রামের পথে আর নিগৃহীত পীড়িতের মর্মবেদনায়।

ব্যস্ত অধীর ; বিধাতার সিংহাসন হতে বহু দূরের শহুরে লোকগুলি এসব কথার কিছুই বোঝে না। তাদের কানের গোড়া দিয়ে নিয়ত বিশ্বের আলোক বাতাস যে সঙ্গীত গেয়ে ফিরছে, তা তাদের জানা নেই।

পল্লীর মানুষই জাতিকে বাঁচিয়ে রাখে। অর্থ দিয়ে, হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তারা জাতির সেবা করে। শত্রু এসে দেশ আক্রমণ করলে কে তাদের বাধা দেয়! গ্রামের অজ্ঞাত অবহেলিত জনসাধারণ, পল্লীর লক্ষ মানুষই

জাতির মেরুদণ্ড। এদের অস্বীকার করলে চলবে না। এদের অর্থ ও জ্ঞানে বড় করতে হবে। শহুরে মানুষ দেশকে ভালবাসে কি না জানিনে। গ্রামখানিকে পল্লীর মানুষ কত আপনার মনে করে। প্রতিবেশীর সঙ্গে তার কত আত্মীয়তা। পল্লীর মাঠ-ঘাট, পুরোনো অশ্বত্থ গাছ, বোস বাবুদের কানা পুকুরটির ধার, প্রবাসী পল্লীবাসী কত আদরে স্মরণ করে। সেখানে তার জীবনের কত স্মৃতি; কত বেদনা, কত জয়, কত ব্যর্থতা জড়িয়ে আছে। এই অন্ধ আনুরক্তির সঙ্গে তার মনে আত্মমর্যাদা জ্ঞান জাগিয়ে তোল, দেখবে সে কি হয়—আর কি করে; শহুরে মানুষগুলি তো কতকগুলি অতিথি। আপনার মধ্যে সে আপনি সীমাবদ্ধ। জগতের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই। সে নিষ্ঠুর, কটুভাষী ও স্বার্থপর। সে ভিখারীর মুখের উপর শব্দের সঙ্গে দরজা আটকিয়ে দেয়। দেশ বলতে তার কিছু নেই। জগতে সে ভাড়া দিয়ে বাস করে।

যখন স্পেনের রাজা বিলেত আক্রমণের জন্যে অগ্রসর হলেন, তখন দেশরক্ষার আহ্বান এসেছিল পল্লীর ইতর ও ভদ্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের কাছে। ওয়াটারলুর যুদ্ধে গ্রামের চাষীরাই বিলেতের গৌরব রক্ষা করেছিল।

কিছুদিন হলো, আমার বাড়ী হতে দুটি ছেলে পত্র লিখেছে,—কলকাতা এসে তারা কোন চাকরি করবে। শহরে এসে থাকতে পেলে যেন তাদের কত সম্মান হবে। বাড়ীতে যে তাদের কিছু নেই তা নয়। পরের গোলামি করে এখানে থেকে নিরন্তর কষ্ট পেলেও তাতে তাদের দুঃখ হবে না। পল্লীবাসীরা মনে করে গ্রামে যারা থাকে তাদের সম্মান মোটেই নেই। যে জমি আছে তাই যদি পরিশ্রমের সঙ্গে চাষ করা যায়—তাতে কত সম্মান কত স্বাধীনতা।

গ্রামের লোকের এতকাল ধারণা ছিল, যার বংশ যত গোলাম তৈরী করতে পারে সে তত শরীফ বা ভদ্রলোক। লোকে গল্পের সময় বলে থাকে, তার শ্যালক ডেপুটি বাবু, চাচা উকিল—অতএব তারা যে খুব ভদ্রলোক তার আর সন্দেহ কি? এই ধরনের জঘন্য চিন্তা জাতির দীনতা ও পাতিত্য প্রকট করে তুলেছে। পল্লীতে থেকে জমি চাষ কর, জ্ঞান ও সত্য জীবন অবলম্বন কর—তোমার স্বাধীন উন্নত ললাটকে আমি চুম্বন করবো। ঘুষ, মিথ্যা ও দাস জীবনের কলঙ্ক ছাপে তুমি উচচস্থান অধিকার করে

বসেছ ; ধিক তোমার জীবনে, ধিক তোমার অর্থে। সেই শুভদিন কবে আসবে, যেদিন পল্লীর মানুষ সত্যের সেবক হয়ে নীচতাকে ঘৃণা করতে শিখবে। অভাবগ্রস্ত দীন জীবনের উঁচু মাথাকে চাকর ভদ্রলোক হওয়া অপেক্ষা বেশী শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করবে।

পল্লীতে যে সমস্ত মানুষ খুব আদর সম্মানে থাকেন, শহরে এলে তাদের কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। পল্লীতে থাকলে তার জীবন দেশের অনেক উপকারে আসতো, শহরে থাকাতে তা নিতান্তই নিরর্থক হয়ে গেছে।

বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী শহরে এসে সমবেত হন। যে মানুষের মূল্য পল্লী গ্রামে কেউ বোঝে নাই শহরের মানুষেরা তাকে বুঝে এবং সম্মান করে। গ্রামে অজানা অচেনা হয়ে বহু শক্তি নষ্ট হয়ে যায়,—কেউ তাকে বড় করে তোলে না। বারুদে আগুন দিলে যেমন করে জ্বলে ওঠে, পণ্ডিত মানুষের সহবাসে প্রতিভাও তেমনি করে জ্বলে ওঠে।

এক সাধুকে এক ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন,—দেখ সাধু, আমি তোমার চেয়ে ভদ্রলোক। সাধু তখন বল্লেন,—এতে তো আমার দুঃখ নেই। জগতে যত ভদ্রলোক হয় ততই ভাল। মন যখন ছোট ও অবনত থাকে, তখন সে মানুষের শক্তি ও গৌরব স্বীকার করতে লজ্জা পায়। এইজন্যে দেখে থাকি, পল্লীর অনেক মানুষ ছোটর উন্নতি ও মঙ্গলে আনন্দ পান না, মহত্ত্ব ও গুণ স্বীকার করতে সঙ্কোচ, কুণ্ঠা বোধ করেন। যে শক্তি পল্লীতে অসাড় ও শক্তিহীন হয়েছিল শহরের গুণগ্রাহী পণ্ডিত মণ্ডলীর স্পর্শে এসে তা অনুরূপ তেজে জ্বলে ওঠে। বড় ও মহৎ যিনি, তিনি চান সত্যের জয়। যেখানেই মনুষ্যত্বের দীপ্তি তিনি দেখেন, সেখানেই তার মাথা নত হয়ে পড়ে। এই মাথা নত করতে তার আনন্দ হয়। সত্য ও মহত্ত্ব স্বীকার করাই যে তার ধর্ম। দুষ্ট ও শয়তানের শুভ দেখলে মনে যদি বিরক্তি আসে তবে তা বিশেষ দোষের নয়।

প্রাচীনকাল হতে শহরে রাজার শাসন-কেন্দ্রের পীঠস্থান হতে সর্ব প্রকার মঙ্গল সূচিত হয়। রাজাসনের অব্যবহার হয়েছে সত্য কিন্তু-রাজার অর্থ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার একটা প্রাণময় শক্তি। মানুষে নিজের মঙ্গলের জন্যে নিজেদের সত্য বুদ্ধি ও ন্যায় বিচারকে শরীরী করে উঁচুতে

বসিয়ে রেখেছেন। রাজশক্তির নিকটে চিরকালই পণ্ডিত দল সমবেত হয়েছেন। জ্ঞান বিজ্ঞানালোচনা, ভাবের আদান-প্রদান ও নানা শুভ উদ্দেশ্যে তাঁরা শহরে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। এখানে এ কথাও বলে রাখি যে পণ্ডিত বা যে দার্শনিক সম্মান ও অর্থলালসায় রাজার সম্মুখে হীন হয়ে ব্যক্তিত্ব হারিয়েছেন তাঁর সাহিত্য ও জ্ঞান সাধনা বৃথা। জ্ঞানের সেবক যিনি, সত্য উদ্ধার যার জীবনের ব্রত, তাকে সর্বপ্রকারে সকল স্থানে, কি শহরে কি পল্লীতে স্বাধীনচিত্ত হয়ে থাকতে হবে।

শহরের সম্পদ দেখে গোটা জাতির অবস্থা সম্বন্ধে বিবেচনা করলে চলবে না। দেশের সমস্ত মানুষের মঙ্গল চাই। শহরের বিলাস-জীবন ও উচচ অট্টালিকা দেখে জাতির সাধারণ মানুষের কথা ভুলে থাকলে চলবে না।

শহর হচ্ছে গোটা জাতিটাকে শুদ্ধ ও বড় করে তোলবার জন্যে কতকগুলি ঋষি ও মানব-সেবকের সাধনা নিকেতন। তাদের ঘিরেই নিয়ত একটা কর্ম-কোলাহল বাজতে থাকে। এটা আসলে মানুষের সম্পদ আহরণের স্থান নয়।

মানুষের নিত্য নিত্য যতই নতুন বিধান হোক না সে কখনও মৃত্যু ও দুঃখের হাত হতে রক্ষা পাবে না। তার কোথাও সুখ নেই। মানুষের মধ্যে বড় রকমের দুঃখ ও অসন্তোষ জাগিয়ে দেওয়া চাই; তাহলেই আমাদের মুক্তি হবে। তৃপ্তির মাঝে জীবন নেই, চাই শহর পল্লী সকল মানুষের অতৃপ্তি ও বেদনানুভূতি—শুদ্ধির জন্যে একটা জীবন ব্যাপী সংগ্রাম।

জনসন শহরে থাকতে বড় ভালবাসতেন। জস্যুয়া রেনলড্‌স বলতেন, লণ্ডন শহর ছাড়া আর কোথাও কথা বলে আমি সুখ পাইনে।

মানুষ যদি তার চিন্তা ও ভাব কারো সঙ্গে বিনিময় না করতে পারে তাহলে তার জীবনে অনেক সময় সুখ থাকে না। বিয়ের পর স্বামী-পত্নীতে যে অমিল হয় তার কারণ অনেকটা এই।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা পল্লীতে জীবনের প্রতিধ্বনি না পেয়ে শেষ-কালে শহরে এসে সমবেত হন। বহু সাহিত্যিক জীবনে অনেক কষ্টের দাগা পেয়েছেন, তবুও তাঁরা শহর ত্যাগ করে পল্লীতে সুখ করতে যেতে পারেননি।

শহরে আমাদের স্বাধীনতা খুব বেশী। কে কি বলবে, এ কথা বড় ভাবতে হয় না। পল্লীতে সমাজের ভয়ে অনেক সত্য কথা চেপে রাখতে হয়।

পল্লীতেও যেদিন শহরের এই স্বাধীনতা লাভ করা যাবে, সেদিন আমাদের কি শুভ দিন, দাগা পেয়ে পণ্ডিতেরা যে দিন গ্রাম ছাড়বেন না সেই হবে আমাদের মুক্তির দিন। পল্লীতে বাস করেও আমরা জীবনের সকল সুবিধা পাবো, জীবনকে সার্থক করতে পারবো—সেই দিনের অপেক্ষা আমরা করছি। বিলেত ও মার্কিন পল্লী তা পেয়েছে।

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

জীবনের ব্যবহার

১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ওহিও (Ohio) নদীর ধারে কতকগুলি ইংরেজ অবস্থান করছিলেন। হঠাৎ কতকগুলি দেশী মানুষ তাদেরকে আক্রমণ করল। চারদিকে বেড়া ছিল তার ভিতর এসে আত্মরক্ষার জন্যে তারা প্রস্তুত হলেন। শত্রুর আক্রমণ বাধা দেবার জন্যে বিশেষ আয়োজন ছিল না। দস্যুরা শিগ্‌গিরই তাদের বেড়া ভেঙ্গে সব লুট করে নিয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সকলকেই খুন করে ফেলবে।

যতগুলি ইংরেজ সেখানে ছিলেন—নারী, পুরুষ, শিশু, বুড়ো সবাই সেই ঘেরার মাঝে জমা হয়েছিলেন।

বাইরে একটু দূরে একটা ঘরে এক পিপে বারুদ ছিল, কিন্তু কে যাবে সেটাকে আনতে? অসভ্য দস্যুগুলি তীর তুলে বসে আছে। সেই ক্ষুদ্র দলটির মুরুব্বী সবাইকে বিপদের কথা বুঝিয়ে বললেন। কয়েকজন যুবক বলল,—আমরা বারুদ আনতে যাবো। সংখ্যায় সেখানে মাত্র ষোল জন পুরুষ ছিল।

একটা সতের বছরের মেয়ে উঠে বললেন,—তোমাদের কারো যাওয়া হবে না। এই ক্ষুদ্র দলের পক্ষে একটা মানুষের জীবনও খুব মূল্যবান। আমি নারী এবং অবিবাহিতা, আমার জীবনের মূল্য খুব কম। তোমাদের জন্যে জীবন দিতে আমি চাই। আশ্চর্যের বিষয় কেউ তাকে তার সঙ্কল্প ত্যাগ করাতে পারলেন না। সাহসী বালিকা বেড়ার দরজা খুলে বাইরে বের হলেন। বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রিম করে তিনি যখন বারুদের ঘরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন তখন সকলে দারুণ শঙ্কায় তার দিকে চেয়ে রইল। সকলেই মনে করছিল, এখনই দস্যুদের তীর এসে তাঁর বুকে পড়বে। খোদা বালিকার মহত্ত্ব ও উচচতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর দয়ায় বালিকা বারুদ কাঁকে করে নির্বিঘ্নে কয়েক মিনিটের মাঝে ফিরে এলেন। সতের বছরের এই বালিকার মনুষ্যত্বের সাহস সেই ছোট দলটিকে বাঁচিয়েছিল।

যে মানুষের মাঝে মনুষ্যত্বের গৌরব আসন নিয়েছে, তার মধ্যে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়, তার সঙ্গে দেহের সৌন্দর্যের কোন তুলনা হয় না। মানব-মঙ্গলের জন্যে মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করে, তা শুনলে কান পবিত্র হয়, লেখনী ধন্য হয়। তাদেরই স্পর্শে এসে জগৎ ধন্য হয়েছে। তাদেরই জয়গান শোনাবার জন্যে আকাশে চাঁদ উঠে। বিশ্বের সৌন্দর্য তাদেরই সম্বর্ধনার জন্যে নত মাথায় দাঁড়িয়ে আছে। উষার বাতাস তাদেরই পুণ্য-মাধুরী বুকে নিয়ে দিকে দিকে ছোটে।

যে জীবন মহত্ত্বের মঙ্গল-আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল না, যেখানে জ্ঞান ও মনুষ্যত্বের দীপ্তি শোভা পেল না---সে জীবনে কাজ কি?

জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করে যদি না তোলা গেল তবে তাকে সুখী করবার জন্যে এত উৎসব আয়োজন কেন? ঐ ছার নিকৃষ্ট মাংসের স্তূপটাকে বাঁচিয়ে রেখে কোন লাভ নেই। ওতে মূল্যবান পোশাক জড়াবারও কারো কোন অধিকার নেই।

জীবনে কাজ করতে হবে। কাজহীন জীবন শত পাপের আবাস। কি বাল্যে, কি যুবক বয়সে সকল সময়েই কাজ চাই। যদি পিতার অগাধ অর্থ-সম্পত্তি পেয়ে থাক, যদি হাতখানি মুখে তুলতেও দশ জন দাস-দাসী হাজির হয়, তা হলেও তোমাকে কাজ করতে হবে, দুঃখ-বেদনার অভিশাপ দিয়ে খোদা এ জগতে অন্তহীন কাজের পথ করে দিয়েছেন।

তুমি অর্থশালী, তোমার কোন কাজ নেই। কত মানুষ নত হয়ে তোমাকে সালাম করে। কত খাবার সামগ্রী তোমার সামনে আসে, কত ভেট-ডালি তোমার মনকে তুষ্ট করে তোলে, কিন্তু তবুও বলি কাজ নেই এ কথা তুমি কখনও ভেবো না। তোমার মনের দিকে তাকিয়ে দেখ, সে কত অন্ধকারে পড়ে আছে। তুমি মানুষ, তোমাকে জ্ঞান-সাধনা করতে হবে। যে পয়সার জন্যে পুস্তক পাঠ করে, সে অধমের অধম।

শিক্ষিত লোককে এবং উচচপদস্থ ব্যক্তিদেরকে বই ও জ্ঞানালোচনার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে হেসে খেলে জীবন কাটাতে দেখেছি। এরা ঘি মাংস খেয়ে থাকে, মানুষ এদের সম্মান করে থাকে। কি মর্মবেদনা!

তুমি অর্থে বড়? তুমি উচচ রাজকর্মাচারী? নবাবের কন্যাকে বিয়ে করেছ? পরিপূর্ণ তৃপ্তিতে মন তোমার ভরে আছে, এতটুকু দুঃখ

তোমার নেই। তোমার ঐ হাসি ও রহস্য আলাপের অন্তরালে দেখতে পাচ্ছি তোমার দীনতা, তোমার দারিদ্র, তোমার পাতিত্য। তুমি তো বড় নও। যে হৃদয় জ্ঞানের সঙ্গে কোন যোগ রাখে না, যে মানুষ মনকে মহৎ ও উচচ করে তোলার জন্যে কিছুমাত্র ব্যগ্র নয়, সে তো ছোট। সে তার সিংহাসন ছেড়ে নীচে এসে দাঁড়াক।

জীবনকে বড় করার জন্যে তুমি কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে নানা শাস্ত্রের আলোচনা করতে পার। এ জগতের কিছুই তো তুমি জান না? এ হেন মানব-জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে—এটা কি সহজ কথা! লক্ষ কোটি বছর পরেও তো এই সাধের জীবনকে ফিরে পাবে না। অতএব কেমন করে তুমি এর অপব্যবহার করতে সাহস পাচ্ছো? আকাশে, তারায়, আলোকে, উদ্ভিদে কত রহস্য গোপন হয়ে রয়েছে---সে রহস্যের সন্ধানে কত মানুষ জীবন কাটিয়েছেন। তুমি কাজ খুঁজে পাও না--এর অর্থ কি?

যে ভাবে ধর্ম পালন করে তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছো, এটা ধর্ম নয়। মানুষের ব্যথা বেদনা—তার পতিত জীবন দেখে যদি তোমার মনে কোন ব্যথা না জাগে, তা হলে তুমি ধর্ম উৎসব কর, আরব দেশে যাও, তোমার বেতন এক সহস্র টাকা হোক—তুমি আসলে ছোট। ধর্মজীবনের সত্য তোমার কাছে ধরা পড়েনি। অন্তহীন নরনারীকে আত্মা দিয়ে, শরীর দিয়ে সেবা করতে হবে—কেমন করে ভাবো তোমার কাজ নেই।

দেশের লোকের মধ্যে দেখেছি মানুষ জীবনে যতই হীন ও নীচ থাকুক না, মৃত্যুর পর কারো দিয়ে কিছু কুরআন পড়িয়ে অথবা কিছু দান করে তার মুক্তির পথ পরিষ্কার করে দেওয়ার আয়োজন হয়। বেশী কিছু করলে অর্থ ব্যয় করে মসজিদ তোলা হয়। মানুষগুলি বোঝে না মসজিদে যাবার আগে মানুষকে মাদ্রাসায় কুরআনের কালামগুলি মুখস্ত করে নিতে হবে। সবাই মসজিদ তুলতে ব্যস্ত। তারা বোঝে না জগতে যদি বিদ্যালোচনা না থাকে তা হলে আপনা আপনি মসজিদগুলি ভেঙ্গে পড়বে। পতিত জাতি কখনও তার ধর্মমন্দির খাড়া করে রাখতে পারবে না। আপনা আপনি খোদার ঘরগুলি ভেঙ্গে মাটিতে মিশে যাবে।

ধর্মমন্দিরের কথা ভাববার আগে আমাদের জ্ঞান-প্রচারের কথা

ভাবতে হবে। মানুষকে উন্নত, জ্ঞানী ও সৎস্বভাব করবার জন্যে যিনি যে প্রচেষ্টা করুন না, তিনি মহৎ, তাঁরই ধর্মজীবন সার্থক হয়, তিনি পুণ্যবান ও বরেণ্য।

চারদিকে লক্ষ নরনারী পাপে, মূর্খতার অত্যাচারে মানুষের উপেক্ষায় তিলে তিলে মরে যাচ্ছে, তাদের জন্যে কি তোমার করবার কিছু নেই? বিশ্বকে উদ্ধার না করতে পার, তোমার গ্রামটিকে কি তুমি উচচ জীবনের ধারণা দিতে পার না? তাদের মধ্যে ধর্ম ও মনুষ্যত্বের বীজ উপ্ত করতে পার না? কত বালক বালিকা, কত যুবকের জীবন নিরাশায় ব্যর্থ হয়ে যাবে? তাদের মধ্যে শক্তি ও বিশ্বাসের আগুন জ্বালাতে পার না? তুমি মানুষ, তুমি ভাব ও ভাষায় প্রাণপূর্ণ প্রতিচ্ছবি—ঘরের কোণায় বসে থাকবার জন্য তুমি নও। আজ হাটের মাঝে তোমাকে এসে দাঁড়াতে হবে। কাজ তোমার অফুরন্ত। বৃথা জীবন নষ্ট করে দিচ্ছ কি বলে? মানুষের পাপ ও ব্যথা দেখে, তোমার মনে জ্বালা উপস্থিত হোক। শয়তানকে হত্যা করবার জন্যে তোমার মাঝে আল্লার মহিমা প্রকাশ হোক।

জ্ঞানালোচনা করার পক্ষে আমাদের দেশে একটা ভয়ানক বাধা আছে। বিদেশী ভাষায় কোন উত্তম পুস্তকও মনকে আনন্দ দান করতে অসমর্থ। নিরানন্দের ভিতর দিয়ে কি জগতে কোন কাজ সিদ্ধ হয়? নিজেদের ভাষায় সহস্র সহস্র বই হওয়া চাই। মানুষের ভিতর জ্ঞানস্পৃহার জন্যে একটা পিপাসা হলেও বিদেশী ভাষায় তা মিটাবার কোন সুযোগ হয় না। জ্ঞান অর্জন পথের এই বাধা জাতির পক্ষে কত বড় ক্ষতির কথা তা আমি বলতে পারি না।

হচ্ছে হবে—এই বলে সময়কে যেতে দিলে, কোন কালে কোন কাজ হবে না। জীবনে হাসি খেলার যে আবশ্যকতা নেই তা বলছিনে। কিন্তু শুধু হাসি খেলা দিয়ে এ সোনার জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়ে লাভ কি? লেখাপড়া শিখে চাকরি করছ। আশা করেছ—জীবন অর্থ উপায়, পান ভোজন, আমোদ উৎসব করেই কাটিয়ে দেবো। জমিদারীতে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়, সুতরাং সময়কে উড়িয়ে দেওয়ার অধিকার তোমার রয়েছে। অনেক টাকা আছে বলে কি কতকগুলি সাগর-জলে ফেলে দেওয়া যায়? সময়ের আর এক নাম অর্থ—তা কি জান? শত

রকমে সময়ের কাছে থেকে লাভ আদায় করে নিতে পার। সময়ের সদ্ব্যবহার করলে তোমার আরও উন্নতি হবে; তখন-তখন ফল পেতে না পার কিন্তু ধীরভাবে বিশেষ কোন সাধনা ধরে থাকলে পাঁচ অথবা দশ বছর পরে তুমি তোমার সাধনার ফল দেখে বিস্মিত হবে। নিজের কোন লাভের জন্যেও যদি পরিশ্রম না করতে চাও, তবে মানুষ—তোমার প্রতিবেশীর জন্য তুমি তোমার জীবনকে সার্থক করো।

এ জগতে জ্ঞান-সাধনা ব্যতীত কোন জাতির সম্মান হয় না। যদি জাতির সম্মান বাড়াতে চাও তা হলে তোমাকে জ্ঞানের সাধনা করতে হবে। জাতিকে বড় করবার জন্যে তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। কারো দ্বারা অপমানিত হয়ে তোমার মর্মবেদনা উপস্থিত হয়েছে, শুধু মানুষকে গালি দিয়ে তুমি নিজের বা জাতির সম্মান বাড়াতে পার না। যার মধ্যে মানুষ জ্ঞান ও চরিত্রশক্তি দেখে তাকেই লোকে সম্মান করে। তুমি নিজে জ্ঞানী ও চরিত্রবান হও, মানুষকে জ্ঞানী ও চরিত্রবান করতে চেষ্টা কর।

বিপুল অর্থ জমিয়েছ, কিন্তু বিশ্বাস কর যাদের জন্যে তুমি এই অর্থ রেখে যেতে চাও, তারা যদি জ্ঞানী ও চরিত্রবান না হয়, তা হলে তোমার অর্থ তাদের কল্যাণ না করে শুধু অকল্যাণই করবে। তোমার অর্থ হবে তাদের পাপ ও অন্যায়ের সহায়। যদি পুত্ররা স্কুল-কলেজে লেখাপড়া না শেখে তা হলেও ইচ্ছা করলে তাদের তুমি মানুষ করে তুলতে পার। এ জন্যে তোমার সাধনা চাই। বাহিরের শিক্ষকদের সাহায্য না নিয়ে তুমি নিজেই তোমার পুত্রগণকে নৈতিক বল দেবার জন্যে পরিশ্রম কর। কুড়েমি করে অথবা অযথা ক্রোধে তাদের জীবনকে ব্যর্থ করে দিও না।

এ জগতে তুমি মানুষকে যা কিছু দাও না জ্ঞান দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান আর নেই। পতিতকে পথ দেখান, জ্ঞানান্ধকে জ্ঞান দান করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

জ্ঞানী হতে হলে স্কুল-কলেজের সাহায্য ব্যতীত তা হবে না, এরূপ মনে করা নিতান্ত ভুল। মানুষ যে কোন অবস্থায় চেষ্টা করলে বড় হতে পারে।

মানুষের ভিতর এমন কোন জিনিস আছে, যাকে তৈরি করলে সে অসাধ্য সাধন করতে পারে। এমন রত্নের মালিক হয়ে যদি তুমি তোমার জীবনকে ব্যর্থ করে দাও, তাহলে তুমি পাগল। কত লক্ষ কোটি

মানুষ মানবাত্মার অধিকারী হয়ে জীবনকে কেমন করে মূল্যহীন করে দিচ্ছে।

তোমার ভিতর অফুরন্ত ক্ষমতা রয়েছে, তুমি অজেয় শক্তির রাজা। কেন তুমি তোমার এত শক্তি, এত সম্পদ হেলায় মাটি করে দিচ্ছ? তুমি মানুষ, তোমাকে জাগতে হবে, তোমাকে দাঁড়াতে হবে, তোমাকে গান গাইতে হবে, তোমাকে বিশ্বের সাথে যোগ স্থাপন করতে হবে। তোমার লুকিয়ে থাকবার অবসর নেই।

জীবনে যদি কিছু করতে চাও, তা হলে অসীম ধৈর্য চাই। মানুষের সাফল্যের অন্যতম কারণ ধৈর্য। আচার্য বসু বলেছেন, বিফলতা দেখে যে দমে যায় না, সেই জয়ী।

কুরআনে বহু স্থানে খোদা মানুষকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন।

কত প্রতিভাশালী যুবকের জীবন আলস্যে ও মূল্যহীন আমোদ-উৎসবে নিরর্থক হয়ে গিয়েছে। সাধনা ও পরিশ্রমের দ্বারা কত সাধারণ মানুষ জীবনকে বড় করে তুলতে পেরেছেন।

ইয়াগো (Iago) বলেছেন, আমাদের জীবনটা কতকটা বাগান বাড়ীর মত। এ বাগানে যেমন ফুলের গাছ লাগাবে, তেমনি ফুলই ফুটবে।

সাধনার কোন কোন ব্যাপারে যদি প্রথম বারে ব্যর্থ মনোরথ হও, পরাঙমুখ হয়ো না---বারে বারে, আঘাত করো, দুয়ার ভেঙ্গে যাবে। তাড়াতাড়ি না করে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। ধরে থাক, ক্রমশঃ তোমার শক্তি ও সুবিধা বাড়তে থাকবে। গিরি শির হতে যখন পাথর খণ্ড নাবতে থাকে, তখন তাকে প্রথমটা দেখে মনে হয় এই নগণ্য পাথরের টুকরাটা কিছু নয়। ক্রমে যখন সে নীচে নেমে আসে, তখন তার শক্তি হয় কত ভয়ানক। সম্মুখে যা কিছু পায়, ভেঙ্গে চূর্ণ করে নিয়ে যায়।

ব্যর্থতা ও দুর্ভাগ্যে বিপদ তোমার সকল উদ্যম ব্যর্থ করে দিচ্ছে। তোমার মনে যে উৎসাহ, যে কর্মশক্তি ছিল, তা যেন নিভে যাচ্ছে। এটা ঠিক জেনো, কোন সাফল্যই সহজে লাভ হয় না। রাস্তার পার্শ্বে যে বড় বড় বাড়ী দেখতে পাও, তার পেছনে একটা মানুষের কত সাধনা, কত বেদনা রয়েছে, তা কি কল্পনা করেছ? এ জগতে শক্তি সাধনার

জয় হয়ে থাকে। বাপ-দাদার সম্পত্তি ও টাকা যারা পায়, তাদের পক্ষে সংসারের কঠোরতা অনুভব করা খুব কঠিন, কিন্তু সাধারণের পক্ষে সুখ ঐশ্বর্য সহজে লাভ হয় না। ধৈর্য ধরে দুঃখ-জ্বালা বাধা-ব্যর্থতাকে উপহাস করে ধরণীর ঐশ্বর্য লাভ করতে হবে।

দুঃখ বেদনার ভিতর দিয়েই তো মানুষের মনুষ্যত্ব জাগে। সুতরাং দুঃখ দেখে ভয় পেলে চলবে না। দারিদ্র্য ও কষ্টের আঘাত খেয়ে যে জগতে আসন রচনা করেছেন, তার মনুষ্যত্ব ও জ্ঞান, সুখ পালিত মানুষের চেয়ে অনেক বেশী।

অনেক বড় লোক তাই নিজেদের ছেলেদেরকে বাল্যে সাধারণ কাজ করতে দেন। এটি উত্তম প্রথা। যতই বড় হওনা কেন, বড় আসন ধরে রাখবার জন্যে জীবনের বহু অবস্থার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হতে হবে। যে সমস্ত বড় লোকের ছেলে কোনকালে দুঃখের পরশ পায়নি, তাদেরও কালে চরিত্রহীন, যথেচ্ছাচারী ও মূর্খ হবার খুবই সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ জীবনে সম্পূর্ণ মানুষ হবার জন্যে আমাদের বাল্যকালে যাবতীয় সাধারণ কাজ করতে হবে, তা আমার অবস্থা যতই ভাল হোক।

অবস্থা যেমনই হোক না, যত বিপত্তিই আসুক না, ইচ্ছা থাকলে পথ হয়ে যাবেই। বিশ্বাসই আমাদের মুক্তি অব্যর্থ করে দেয়,—সঙ্কোচ অবিশ্বাস মানুষকে নিতান্ত দরিদ্র করে রাখে। বিশ্বাসের শক্তি কতখানি, মানব-জীবনের কাছে এ যে কত বড় দান, তা আমি ভাল করে পরে বলবো। ইচ্ছা ও বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম শক্তি তোমার জাগ্রত হবে, তোমার সম্মুখের কুয়াসার ভিতর দিয়ে জয়ের পথ পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

জীবনকে যদি উন্নত করতে না চাও, তবে ধীরে ধীরে তোমার পতন হয়ে থাকবে। মানুষ একই অবস্থায় থাকতে পারে না—হয় তাকে সামনে এগোতে হবে, নইলে পেছনে হটতে হবে, এইটে হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। এক জায়গায় সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। অহঙ্কারে যদি মন ভর্তি হয়ে থাকে অথবা চুল পেকেছে বলে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে চুপ করে বসে থাক, তবে প্রতিদিন তোমার অধঃপতন হতে থাকবে।

জীবনের কোন অবস্থায় নিজকে সম্পূর্ণ মনে করো না। এ করলে তোমার মনের অবনতি অবশ্যম্ভাবী—সে অবনতি তুমি কিছুই বুঝতে পাবে না।

অর্থ, ক্ষমতা ও মর্যাদার অহঙ্কারে যদি ভিতর ও বাইরের দিকে না তাকিয়ে, চোখ বুজে বসে থাক, তা হলে বুঝব তুমি দরিদ্র, একটা অনাবশ্যক মাংসস্তূপ—যে জগতে এসেছিল একেবারেই বিনা কারণে—তার গুণহীন দেহটাকে শুধু বাঁচাতে।

অসত্য জীবন যাপন করে মানব সেবার কোন আবশ্যকতা নেই। যে হৃদয় পাপে ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে না, তার মানুষের কল্যাণ কামনা করবার কোন অধিকার নেই। এক ডাক্তার ভায়াকে আমি দেখেছি, তিনি দিবারাত্র জাতির কল্যাণ কামনা করেন, অথচ তিনি মানুষের নিকট হতে অম্লানভাবে ঘুষ গ্রহণ করেন।

ইসলামের মুক্তির অর্থ সত্য ও ন্যায় জীবনের প্রতিষ্ঠা,—মানব-প্রেম, অসত্যের বিনাশ। যে মানুষ প্রতিবেশীর অর্থ অপহরণ করে, যে নিজের চরিত্রকে পবিত্র ও নির্মল করতে সচেষ্ট না হয়, যে মূর্খ ও নীচ, যে মানুষকে কঠিন কথা বলতে লজ্জা বোধ করে না—সে যেন সমাজের কল্যাণ চিন্তা না করে। সেই দুর্বৃত্ত ভণ্ড যেন ইসলামের স্বাধীনতা না চায়। দূর হোক সে আমাদের ভিতর হতে।

ফিলিপ সিডনি (Philip Sydney) বলেছেন, কোন পথ যদি না থাকে, তবে আমি একটা তৈরী করে নিতে পারি। সত্যি তো—জীবনকে উন্নত করবার পথ কোন অবস্থাতেই রুদ্ধ হয় না, চাই তোমার আগ্রহ। যে কাজে পাপ ও অন্যায়ের ছায়া নেই তা করতে এত লজ্জা কেন? মানুষের পদ-লেহন করতে লজ্জা হয় না। খোদার আদেশকে অমান্য করে পয়সা উপায় করতে তোমার মনে ভয় হয় না? অন্ধ সমাজ যে কাজকে হীন বলছে,—বিশ্বাস কর সে কাজ হীন নয়। তোমার উপর যারা নির্ভর করে আছে, তাদের অভাব দারিদ্র্য ঘুচাবার জন্যে মানুষের কাছে দুর্বলতা জানিও না বা অর্থ ভিক্ষা করো না। আল্লাহ্‌র দেওয়া দুই বাহু আছে, তাই পরিচালনা করে তুমি জীবনের পথ কেটে নাও। যদি সমাজ ও পরিচিত লোক দেখে লজ্জা হয়, তবে কোন অপরিচিত

দূর দেশে চলে যাও। আমেরিকা, বিলেত ও জাপানের বহু উদ্যমশীল মানুষ কত সাধারণ কাজ করে জীবনকে উন্নত করেছেন, সে খবর হয়ত তোমরা রাখ না।

মহৎ মানুষের একটা স্বভাব হচ্ছে এই যে, তারা মানুষের ব্যথা দেখে চুপ করে থাকতে পারেন না। ডাক্তার জনসনের বাড়ী ছিল দীন-দরিদ্রের আখড়া। অপরিচিত দুঃখী মেয়ে-পুরুষ সবাই তাঁর পরম আত্মীয় ছিল। একবার একটা খোকা পথের মাঝে কেঁদে তাদের দুরবস্থার কথা জানায়। সেই ছেলেটিই তার বুড়ী মায়ের একমাত্র অবলম্বন। কোন লোকের দরকার ছিল না, তবুও জনসন ছেলেটিকে তখন-তখন চাকরি দিলেন।

মানুষের ব্যথা বেদনা যা'র মনকে দুর্বল না করে, সে বড় দরিদ্র। মানুষের সাথে মানুষের পার্থক্য কি?—একরত্তি না,—অনুভূতি সবারই সমান। ব্যথিত মানুষকে সম্মুখে দেখে কোন্ প্রাণে আনন্দ কর? এ জগতে দেখি বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা দুঃস্থ মানুষের জন্যে সর্বস্ব দান করেছেন, কিন্তু তবুও তাঁদের অভাব হয়নি। খোদার উপর যাদের গভীর বিশ্বাস আছে, তারাই এমন মহাপ্রাণের পরিচয় দিতে পারেন। খোদার উপর বিশ্বাসের অর্থ এ নয় যে, তিনি সোজাসুজি আকাশ থেকে নেমে এসে তোমার বালিশের নীচে ধনরত্ন রেখে দেবেন। খোদা পরিশ্রম ও সাধনার মূল্য দিয়ে থাকেন। মানুষের দুঃখে যদি সত্যই তোমার দয়া হয়, তা হলে তাদের কথা স্মরণ করেই তোমাকে চতুর্গুণ পরিশ্রম করতে হবে। ঘরে বসে তুমি মানুষকে সাহায্য করতে পারবে না। মানুষকে সাহায্য করবার জন্যে যদি তুমি জীবন ভরে সুযোগের আশায় বসে থাক তা হলে সুযোগ হয় তো জীবনে আসবে না। দরিদ্রকে সাহায্য কর এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম কর, খোদা তোমাকে অর্থ দেবেন। তুমি যে মানুষের সেবক,—তোমার হাতে অর্থ যদি না আসে তা হলে খোদার মহিমা, তাঁর সব কথাই যে মিথ্যা হয়ে যাবে।

মানুষকে ভুলে দরিদ্রকে ব্যথা দিয়ে যদি তুমি অর্থ আহরণ করতে থাক, তা হলে খোদার অভিশাপের জন্য তোমার মাথা ঠিক করে রেখো। কে সেই নরপিশাচ, যে দরিদ্রের বুকের রক্ত নিংড়ে গৃহিণীর গয়না প্রস্তুত

করে? ঈদের দিন ছেলেদের জামা কাপড় কিনে দেয়? তোমরা কে কে তার সঙ্গে কথা বলছ?

অনেক মানুষ আছে, যারা নিজের আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত বন্ধুবান্ধব ছাড়া বাকী সকল মানুষের প্রতিই নিষ্ঠুর; বলেছি তো, মানুষে মানুষে পার্থক্য কি? মানুষের যে ভাই, সে তো তোমারই ভাই, অতএব তাকে আঘাত দাও কোন্ সাহসে? মানুষকে তুমি কেমন করে কঠিন কথা বল? তোমার লজ্জা হয় না? তুমি কার পয়সা নিজের ঘরে নিয়ে যাচ্ছ? কাকে ক্ষুধিত রেখে তুমি নিজের উদরপূর্তি করবার আয়োজন করছ?

ছোটদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা মোটেই ভদ্রতা নয়। যে মানুষ দরিদ্র ভৃত্যের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে পারে না, সে যেন মানব দুঃখে বেদনা প্রকাশ না করে। এই অসহনীয় ভণ্ডামির শেষ হোক। এক সময় রাজা পিটার তার ভৃত্যকে প্রহার করেন, সেই প্রহারেই ভৃত্যের মৃত্যু হয়। সম্রাট কেঁদে বলেছিলেন, আমি মানুষকে শাসন করবার ব্রত গ্রহণ করেছি, কিন্তু হায় নিজকে শাসন করতে পারিনি।

বড় লোকেরা জানে না, তাদের দরিদ্র পিতা-পিতামহেরা মানুষের কাছে কত ছোট হয়ে যশঃ ও সম্মান অর্জন করেছিলেন। সুখের কোলে পালিত বড় লোকদের দরিদ্র অত্যাচারিত মানুষের বেদনা বোঝবার কোন ক্ষমতা নেই। তারা অজ্ঞাতসারে অত্যাচারী হয়ে পড়েন। জগৎ ও মানব-সমাজ সম্বন্ধে তাদের ধারণা খুবই অসম্পূর্ণ।

জীবনকে উন্নত করবার জন্যে তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্রে অতি অল্প লোকেই পূর্বপুরুষের অর্থ সম্পদ লাভ করে থাকে। পিতার বা শ্বশুরের সম্পত্তির লোভ তুমি করো না। শক্তি সাধনা করে তোমাকেই বড় হতে হবে। কে বলে পুরুষের সম্মুখে বাধা রয়েছে? চাই শুধু তোমার উচচ জীবনের ইচ্ছা। চাই তোমার জীবনের প্রতিমুহূর্তের সদ্ব্যবহার। হাসি গল্পের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু হাসি গল্প করবার জন্যে তো তোমার স্ত্রী ও বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। রহস্যালাপ করা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ, কিন্তু তাই বলে রহস্য করে জীবনের অধিকাংশ সময় নষ্ট করে

ফেলো না। কাজ কর, কাজ করতে অভ্যাস কর। এমন দিন আসবে যখন অবসর তোমার কাছে মোটেই ভাল লাগবে না। জীবনে যে কাজই কর না, যে অবস্থাতেই থাক না, তোমার সকল উন্নতির মূল তোমার বুদ্ধি ও জ্ঞান। জীবনের সকল অবস্থায়, সকল সময়ে তোমাকে ভাবতে হবে, পড়তে হবে। জ্ঞানের আলোক-রথ নিয়ে তুমি যেদিকেই যাও না কেন—সিদ্ধি তোমার ধরা রয়েছে। জ্ঞানকে বাদ দিয়ে যিনি জীবনকে উন্নত করতে চান, তিনি সফলতা লাভ করতে পারবেন না। এ জগতে মূর্খের কোথাও স্থান নেই।

অনবরত কাজ করে করে চিত্ত যেন নীরস-কঠিন না হয়ে উঠে। পত্নী-ভাই-বন্ধুদের সঙ্গে স্নেহ মমতার আদান-প্রদান হওয়া, মানুষের সঙ্গে লৌকিকতা করা—জীবনে এ সবেরই প্রয়োজন আছে—নইলে মানবজীবনে একটা অভিশাপ বিশেষ হয়ে উঠবে। জীবন শুধু কাজ নয়, এর একটা রসের দিকও আছে। প্রীতি-ভালবাসা প্রেম-প্রণয়হীন কাজের যন্ত্র হয়ে যদি সংসারে বাঁচতে চাও, তা হলে তুমি হতভাগ্য। দারিদ্র্যের কষাঘাত অসহ্য। অভাবের তাড়না লজ্জাজনক, পাওনাদারদের তাগাদা জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট করে, তা ঠিক; কিন্তু তাই বলে অনবরত কাজ আর কাজ নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ানোও ঠিক নয়। অত্যধিক পরিশ্রমে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে, কোন কঠিন ব্যধি হওয়াও অসম্ভব নয়। জীবনে যাদের সঙ্গে যোগ রয়েছে তাদের কাছেও অপ্রীতিকর হয়ে উঠতে হয়।

যারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করতে অভ্যস্ত তারা যেন নিয়মিত ভাবে শারীরিক আমোদ ক্রীড়ায় যোগ দেয়। আজকাল বন্দুক জিনিসটি সংগ্রহ করা বড় কঠিন, নইলে বন্দুক নিয়ে শিকার সন্ধানে বের হওয়া খুব চমৎকার। এতে যেমন আনন্দ তেমনি পরিশ্রমও হয়।

যারা মানসিক পরিশ্রম করেন তারা সংসারের কাজও খুব করতে পারেন। উচচ শ্রেণীর চিন্তাশীল লেখক ও পণ্ডিতেরা হাতে কোন কাজ করতে লজ্জা বোধ করেন, তা বলছি না, আলস্য বশতঃ অথবা শরীরের প্রতি অবহেলা করে তারা সাধারণতঃ কোন পরিশ্রমের কাজই করতে চান না। মানসিক পরিশ্রমের সঙ্গে ভাল আহার শারীরিক পরিশ্রম

যদি না হয়, তা হলে নানা ব্যাধি এসে দেখা দেবে। মাটি কোপান, কাঠ-ফাড়া এবং সংসারের কাজে কোন লজ্জা তো নেই বরং এতে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। যারা শারীরিক পরিশ্রম করবার সুযোগ পায় তাদের শরীর খুব শীগ্‌গীর ভাঙ্গে না। এজন্য গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের শরীর ও মন কুড়ে বিলাসী ঘরের মেয়েদের চেয়ে অধিক সুস্থ ও প্রফুল্ল।

দানিয়াল ওয়েবেস্টর (Daniel Webester) সাহিত্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে নিজ হস্তে জমি চাষ করতেন। কিছুকাল আগে দেশের কতক-গুলি লোককে নিজ হাতে জমি চাষ করবার জন্যে ভারি উৎসাহান্বিত দেখেছিলেন। এখন সে স্ফূর্তি আর নেই। যে জাতি মনে করে, শারীরিক পরিশ্রম মানুষকে ছোট করে, তারা নিকৃষ্ট, তারা পতিত। পাপ ও অন্যায় কর্মে মানুষ ছোট হয়, পরমুখাপেক্ষী হয়ে এবং মনের স্বাধীনতা হারালে মানুষের অসম্মান হয়। সত্য ও পবিত্র জীবন ত্যাগ করে যে সব দুর্বৃত্তের দল অন্যায়ের সেবা ক'রে পয়সা উপায় করে, ধিক্ তাদের জীবনে, মন তাদের কত ছোট; এই শ্রেণীর লোক নিজদেরকে ভদ্রলোক বলে যদি পরিচয় দেয়, তাহলে মানুষ যেন তা শুনে হাসে।

শেলী পানির মধ্যে কাগজের নৌকা ভাসাতেন। এইভাবে সাহিত্যা-লোচনার শ্রান্তি হতে তিনি শান্তি সংগ্রহ করতেন। প্রতিদিন চার মাইল হাঁটার কমে ডিকেন্সের পেটে ভাত হজম হতো না, নিত্য ঝড়-ঝাপট বৃষ্টি-বাদলা কিছু না মেনে মুক্ত আকাশতলে একটু ঘোরা-ফেরা তাঁর চাই। সাদি (Southey), ওয়ার্ডসওয়ার্থ খুব হাঁটতেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে রাজ্যসুদ্ধ ঘুরে বেড়াতেন, তা তাঁর লেখা হতেই বোঝা যায়। ফুলে-ভরা মুক্ত প্রান্তর, নির্ঝরের সঙ্গীত, মেঘে-ভরা আকাশ, ছবি, এ সবের মাঝে তিনি ভাষা খুঁজে বেড়াতেন। মৌন প্রকৃতির অন্তরের মাঝে মিশে তিনি আত্মার বাণী শুনতেন—বিশ্বব্যাপী বিরাট অনন্ত-পুরুষের বাঁশী তাঁর শিরায় শিরায় ধ্বনিত হয়ে উঠত।

শেলী অনেকবার ঘোড়া হতে আছাড় খেতেন, কিন্তু তবু তাঁর শিক্ষা হতো না। যেমন পড়তেন তেমনি চড়তেন, শেষকালে একেবারে পাক্কা ঘোড়সোয়ার হয়েছিলেন।

শিক্ষিত ভদ্রলোক যিনি, তিনি নড়ে বসবেন না, একটা না একটা ব্যাধি লেগে আছে—কোন পরিশ্রমের কাজ করতে তার নিতান্ত অনিচ্ছা, ঘোড়ায় চড়া তো একেবারেই অসম্ভব। এ সব হচ্ছে অভিশপ্ত জীবনের দুরবস্থা। উচচ জীবনের সঙ্গে কি শক্তি, স্বাস্থ্য ও পরিশ্রমের কোন যোগ নেই? জগতের অনেক মহৎ ব্যক্তি দুর্বল হয়ে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁদের শিক্ষা ও সত্য যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের কিন্তু কৃশ ও দুর্বল হয়ে কাজ চলেনি।

দরিদ্র অশিক্ষিত পরিচিত আত্মীয় বন্ধুকে আপন বলে পরিচয় দিতে যারা লজ্জাবোধ করে, তাদের মন অত্যন্ত দুর্বল। আমার শত শত ভাইকে নিয়ে তো আমাকে উঠতে হবে। তাদেরকে অস্বীকার করলে চলবে না। লম্পট হৃদয়হীন অত্যাচারী মানুষকে আত্মীয় বন্ধু বলে পরিচয় দিতে সঙ্কোচবোধ করা ভাল, কিন্তু দরিদ্র পূত চরিত্র সরল বর্বর, পরিশ্রমী মানুষকে আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে মনে যেন কোন সংকোচ না আসে। জীবনের পক্ষে এ একটা বড় কলঙ্ক। মানুষের নাম নিয়ে তুমি বড় হতে যেয়ো না, তোমার নামেই মানুষের সম্মান হোক।

বেলজিয়ামের মন্ত্রী মেলাম, বিলেতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ গ্লাডস্টান কুড়োল দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ কেটে নামাতেন। এ জন্য তাদেরকে কেউ ছোট লোক বলেনি। এগুলি হচ্ছে পৌরুষ।

ইংরাজ জাতি হাজার লক্ষ পথে নিজেদের জীবনকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করে। ইংরাজকে ঘৃণা করলে চলবে না। উপযুক্ত গুণ স্বীকার না করলে আমাদেরই ক্ষতি হবে। আফ্রিকার বনজঙ্গলে, মেরু প্রদেশের তুষার তরঙ্গে, অনন্ত সমুদ্রের বুকে, অতলের তলে, ভূগর্ভে, আকাশে, পর্বতে—সর্বত্র সে তার শক্তি নিয়ে ছুটাছুটি করছে। তাদের মধ্যে শক্তি ও গুণ আছে বলে যে তাদের কোন জাতিকে অসম্মান করবার ক্ষমতা আছে, এ আমি বলছি না।

কত ইংরাজ সামান্য সামান্য বিষয় নিয়ে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিয়েছেন। এই সব কলকারখানা ও নৈমিত্তিক সুখ উপকরণের অন্তরালে কত মানুষের চিন্তা ও সাধনা রয়েছে, তা কি কেউ ভেবে দেখবে না?

শুধু চাকরি—দাসত্ব মানব-জীবনের গৌরবের জিনিস নয়। নানা রকম আমাদের জীবনের শক্তিকে সার্থক করতে হবে। যে জাতি এক সময় জগতে কত উচচ স্থান অধিকার করিয়াছিল, সে আজ সামান্য দু-একশো টাকার জন্যে কত দীনতা স্বীকার করে। নিজেদের গৌরবময় অতীত ইতিহাস হয়ত কেউ জানেনা। ভিতরে যাদের বড় বলে অনুভূতি রয়েছে, সে কি কখনও অস্থিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে?

অজ্ঞান ও মূর্খতা হচ্ছে সকল দুঃখের মূল। আবার একথাও ঠিক, যারা অত্যন্ত মূর্খ তাদের বিশেষ কোন দুঃখ কষ্ট নেই। গরু-ঘোড়া বা কুকুর-শৃগালের কোন বেদনা নেই। তার মানে এদের আত্মসম্মান জ্ঞান নেই। তার মানে এদের ভিতর কোন বোধ বা চিন্তা করবার ক্ষমতা নেই। মানব জীবনের দুঃখ কষ্টের হাত এড়াবার জন্যে কেউ কি খোদার কাছে প্রার্থনা করে—হে খোদা, তুমি যদি আমায় কুকুর করে সৃষ্টি করতে, তা হলে জীবন কত সুখেরই না হতো। হীন জীবনের অসম্মান ও নিগ্রহ কুকুরে না বুঝলেও মানুষ তা দেখে অশ্রু ফেলে; পশুর অনুভূতি নেই বলেই সে তার দীনতা ও বেদনা বুঝতে পারে না, সত্য করে কি তার জীবন মানুষের ঈর্ষা আনে? মূর্খের জীবনে পশুর সুখ থাকতে পারে, কিন্তু চিন্তাশীল মহানুভব ব্যক্তি তার পতিত জীবন দেখে অশ্রু বিসর্জন করেন। মানুষের জীবন এমনভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে, এ তার সহ্য হয় না। তিনি মানুষ মানুষ বলে পাগল হয়ে সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। মহানবী মুহম্মদ (দঃ)-এর জীবন-কথা আবৃত্তি করতে যেয়ে অনেকে বলে থাকেন, "আমাদের মহানবী তাঁর উম্মতের (শিষ্যমণ্ডলী, মুসলমান জাতি) জন্যে অসীম প্রেম পোষণ করতেন। এদের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত তিনি শান্ত হবেন না। তিনি খোদার কাছে দাবী করে বলবেন—হে দয়াময় তুমি আমার শিষ্যমণ্ডলীর মুক্তি দাও।"

এইখানে একটা কথা বলা দরকার। জাতিকে যত কথাই বল না, নৈতিক যত বিধিই প্রণয়ন কর না, যত ধর্ম ব্যবস্থাই থাক না—যাবৎ না তার ভিতরের মানুষটি চোখ খুলে প্রত্যেক কথা বুঝতে চেষ্টা না করে, তাবৎ তার কল্যাণ নেই। কোন বিধি ব্যবস্থা, কোন মহাপুরুষের বাণী

তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। তার অধঃপতন হবেই। প্রত্যেক মানুষের ভিতর এমন একটা জিনিস আছে যে সুবিধা ও সুযোগ পেলে জগতের প্রত্যেক কথা বাজিয়ে গ্রহণ করতে চায়। ইংরাজ পণ্ডিতেরা এই জিনিস বা শক্তিটাকে যে কথায় প্রকাশ করেন, তার বাঙ্গলা অনুবাদ 'বিবেক'। ভালমন্দ বুঝিয়ে দেবার জন্যে মানব জাতির পক্ষে এর মত মহাগুরু আর নেই। ইনিই আমাদের ভিতরের অন্তর মানুষ। আঘাত করে যদি একে অন্ধ করে ফেলা হয়, তবে তুমি যত বড় মহাপুরুষই হওনা, তুমি বড় দুর্ভাগ্য। তোমার পতন হবে। মহাপুরুষেরা যে সব কথা বলেছেন তা শুধু মেনে নিতে হবে,—তার সত্য ভালমন্দ বিচার করাটা দোষের—এইরূপ চিন্তা নিয়ে যারা জীবন চালায়, তাদের ভবিষ্যৎ ভয়াবহ! বিনা কারণে নিজের বাহাদুরী ফলাতে গিয়ে কোন মহানবী বা কোন মহাপুরুষকে উড়িয়ে দিতে হবে, এ আমি বলছিনে—আমি বলছি বিনয়নম্রভাবে সত্য অনুসন্ধানের মন নিয়ে তোমাকে প্রত্যেক কথায় সমালোচনা করতে হবে। তবেই তোমার মুক্তি।

যা বলছিলাম—হযরত মুহাম্মদ (দঃ) পতিত পাপান্ধ অনুভূতিহীন মানুষের জীবন দেখে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন—সোনার মানবজীবন কেন এত পাপে কলঙ্কিত হবে? মানুষের পাপ তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

তিনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে ভালবাসেন, শেষ দিন তিনি 'মানব' নাম উচচারণ করবেন এই কথা বলেই আমরা তৃপ্তি যদি লাভ করি, তাহলে আমরা অপদার্থ। তিনি আমাদের পাপ ও অন্ধতা দেখে কেঁদেছিলেন সে কথা আমাদের স্মরণ নেই, আমরা কেবল তাঁর দয়ার মহিমা প্রচার করি। কি বিড়ম্বনা, বিবেক ও চিন্তাহীন জাতির পতন কি আশ্চর্য ভাবে সংঘটিত হয়।

জীবনকে শুদ্ধ ও পবিত্র করে তুলতে হবে। কারণ এটাই ধর্ম। শুধু উপাসনা ও মহাপুরুষের ভক্তিপূর্ণ নামোচচারণ আমাদেরকে মুক্তি দেবে না।

জীবনের পাপ ও কলঙ্ক মুছতে চেষ্টা না করে আল্লাহ্ দয়াময় একথা বলো না।—উহা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকের কথা। জীবনকে শুদ্ধ ও পবিত্র

করবার জন্যে তোমার ভিতরে একটা আন্তরিক চেষ্টা হোক। সাধুরাই জীবনকে পবিত্র করবে, এরূপ কল্পনা করা নিতান্তই অন্যায়। প্রত্যেক মানুষকে বড় হতে হবে। প্রত্যেক মানুষকে সাধু হতে হবে। প্রত্যেককে ব্রাহ্মণ দরবেশ হতে হবে। মানুষের পক্ষে ছোট ও শূদ্র হয়ে থাকা অধর্ম ও পাপ। সাধু সন্ন্যাসী বলে কি স্বতন্ত্র একটা মানব সমাজ আছে!

নিষ্ঠুর কথা বলতে, একটা কঠিন বাক্য ব্যবহার করতে তোমার যেন লজ্জা হয়। নিষ্ঠুর কথা প্রয়োজন হলে বলতে হবে, কিন্তু এই রূঢ় কথা ব্যবহার করবার আগে ভেবে দেখ, তোমার কার্যটি ন্যায়ানুমোদিত কি না?

মানুষের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করে যে খোদার সঙ্গে প্রেম করতে যায়, তার বুদ্ধি খুব কম। মানুষের একটা বিশ্বাস এসেছে---অন্যায় ও পাপে জীবনকে কলঙ্কিত কর, কোন ক্ষতি নেই,--আল্লাহ্‌কে ডাকলেই সকল পাপ ধুয়ে যাবে। এটা যে মিথ্যে কথা—এ সকলে বিশ্বাস করো।

আমি দ্বিতীয়বার বলছি, জীবনের পাপকে দূর করবার চেষ্টা না করে, শুধু আল্লাহ্‌র কাছে প্রেম জানালে চলবে না। তার দয়া ভিক্ষা করলেও কাজ হবে না,---তিনি দয়াময় এ কথা বলাও কিছু নয়। প্রাণান্ত সাধনা করেও যদি ভুল হয়ে যায় তবে সেজন্য খোদার স্নেহ রয়েছে, এ সত্য,---তিনি দয়ালু এটা ঠিক, তাই বলে পাপ ও অন্যায় করবার অধিকার নেই।

পাপ ও অন্যায় বুঝতে হলে আত্মার অনেকখানি জ্ঞান লাভ করতে হবে। মূর্খ যে কাজ বা যে ঘটনাকে নির্দোষ বলে মনে করে, জ্ঞানী সেখানে হীনতা ও অসম্মান ভেবে সরে পড়েন। জীবনের পাপ ও কলঙ্ক বোঝবার মত মন হওয়া চাই। আমি একটা মানুষকে জানি তিনি জীবনে বহু পাপ করেছেন, অথচ অসঙ্কোচে আল্লাহ্‌কে লক্ষ্য করে বলে থাকেন---হে খোদা! আমি তো জীবনে কোন অন্যায় করিনি!

মানুষের সঙ্গে অন্যায় ব্যবহার করে যে বড় গলায় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে সে মূর্খ। যার কাছে যে অপরাধ করেছ, ক্ষমা চেয়ে নাও,---তারপর উষার মহিমার মাঝে আল্লাহ্‌র প্রেমে নিজকে হারিয়ে ফেলো।

ব্যথিতের দীর্ঘশ্বাসকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্যে খোদার দূতেরা আকাশ পথে এগিয়ে আসেন এ কি কেউ জান না ?

দুর্বৃত্ত নরপিশাচের মনে ব্যথা দিতে হবে না তা বলছিনে। দুর্বৃত্তের তো শাস্তি হবেই। সাধু ও উচচ জীবন দুর্বৃত্তকে দলন করেই তো সার্থক হয়।

অন্যায়ের অভিশাপ বড় ভয়ানক, পীড়িত মানুষ যত ছোটই হোক তার ব্যথাকে ভয় করতে হবে। তোমার অর্থ, তোমার পোশাক, তোমার দাসদাসী, তোমার গায়ের শক্তি তোমাকে পীড়িতের নিক্ষিপ্ত অদৃশ্য বান হতে রক্ষা করবে না।

মানুষকে সম্মান করা জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ। ছোটলোককে সম্মান করতে তার ক্ষতি হয় একথাও ঠিক। দুর্বল ও পাপীকে সম্মান করলে অনেক সময় তার মাঝে মনুষ্যত্বের কিরণ যেয়ে পড়ে, তার ফলে তার কল্যাণ হওয়া সম্ভব। যে মানুষ মূর্খ ও দুর্বৃত্ত তাকে শ্রদ্ধা করলে সে নিজকে বড় মনে করে মহৎ জীবনকে অবজ্ঞা করতে লজ্জাবোধ করে এও ঠিক। জীবন কি ভাবে চালাতে হবে, মানুষের সঙ্গে ঠিক কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, জীবন পথের শত রহস্যের কি ভাবে মীমাংসা করতে হবে,---এ সম্বন্ধে ঠিক করে কিছু বলে ওঠা কঠিন। তোমার ভিতর যে অন্তর মানুষ রয়ছে, তাকে অপমান করো না। অপমানে তার মরণ হয়। ওগো, তাকে মেরে ফেলো না। জীবনের সকল সময় সকল অবস্থায় আলোকে, অন্ধকারে, পাহাড়ে, মাঠে, মরুভূমে সাগরে সর্বত্র তোমার শুভ সে বলে দেবে।

মানুষকে যত পার ঘৃণা বা অবজ্ঞার চোখে দেখ না। যতটা সম্ভব মানুষকে আদর ও শ্রদ্ধা করতে হবে। অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা বলে থাকেন---তাদের মত ভদ্রলোক আর দেশে নেই। যথার্থ ভদ্রলোকের পক্ষে ঐরূপ কথা বলা কঠিন, এ কথা বলে তিনি আনন্দ পান না। মানুষ ছোট হয়ে থাকাতে প্রকৃত ভদ্রলোকের মনে অনন্দ হয় না---তিনি চান, মানুষের কল্যাণ, পতিতের উন্নতি। গৌরব অহঙ্কার করে নিজের বংশমর্যাদা প্রচার করবার সময় তার নেই। হায়, যারা বংশমর্যাদার অহঙ্কার করবার জন্যেই বেঁচে আছে, তারা কত দরিদ্র!

তোমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা—আল্লার কাজ করা। শুধু অর্থের জন্যে বেঁচে থাকা নয়। জীবন সংগ্রাম খুব কঠিন হয়েছে, তা স্বীকার করি, কিন্তু এরি মধ্যেই তো বেশী করে আল্লাহ্‌র কাজ করতে হবে।

আল্লাহ্‌র কাজের অর্থ শুধু মসজিদ-তোলা, কুরআন পড়ান এবং কাবা শরীফে যাওয়া নয়। এ তুমি বিশ্বাস কর। মসজিদ-তোলা, কুরআন পাঠ এবং কাবা শরীফে যাওয়াকে আমি অবজ্ঞা করছি, এ যেন কেউ মনে না করে। অন্ধের মত সঙ্কীর্ণ নিষ্ঠুর প্রাণ নিয়ে শুধু এই তিনটি কাজ করলেই আল্লাহ্‌র কাছে তোমার মঙ্গল হবে না।

আল্লাহ্‌র কাজের অর্থ—মানুষকে কল্যাণ ও মহত্ত্বের পথে টেনে নেওয়া। শত মূর্খকে মসজিদে ভর্তি করে আল্লাহ্ আল্লাহ্ করলে মসজিদের কোন গৌরব বাড়বে না। আল্লাহ্‌র ধর্মও তাতে পালন হবে না, আল্লাহ্ চান খাঁটি মানুষ, সত্যের সৈনিক, তাঁর জীবের সেবক, পরদুঃখকাতর মহাপ্রাণ বান্দা। দুঃখীকে রক্ষা করে আল্লাহ্‌র কাজ কর, পতিত ও পাপীর জন্য অশ্রু বিসর্জন কর, তোমার ক্ষুধার্ত দেশবাসীর জন্যে তোমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠুক। অত্যাচার ও অবিচার দেখে তোমার কঠিন শোক উপস্থিত হোক।

আত্মসর্বস্ব হয়ে যদি কুরআন পাঠ কর,—তুমি আল্লাহ্‌র কাজ করছ, এ কথা বলা হবে না। ওরে অন্ধ! কুরআনের মাঝে কি লেখা আছে তা কি তুমি দেখ না? শুধু অক্ষর আবৃত্তি করেই জীবন শেষ করলে!

নারী পাঠিকার জন্যে বিশেষ করে গুটিকয়েক কথা বলার আছে। নারী সব সময় নিজকে নিঃসহায় মনে করে, তার কারণ সে তার হাত পায়ের ব্যবহার জানে না। শুধু সাজ পরে পুরুষের মনোরঞ্জন করেই নারীর বেঁচে থাকা কঠিন। আজ স্বামী বেঁচে আছেন, কাল যদি হঠাৎ তিনি মারা যান, তা হলে তুমি কোথায় যাবে? যদি বাপের বাড়ী চলে যাও, তা হলে তোমার ছেলেপিলের ভার কি ভাই ও ভাই-বউরা নেবেন? যে এতদিন সমাদরে রাজরানীর হালে স্বামীর ঘর করেছে তার পক্ষে পরের মুখের দিকে চেয়ে দাসীর অসম্মানে বেঁচে থাকা কি সম্ভব? তুমি তোমার জীবনকে ইচ্ছা করলে পুরুষের মতই সার্থক করে তুলতে পার,

তোমার চার দিককার পুরুষগুলি তোমাকে ঠাট্টা করুক, কিন্তু তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর। তোমার ভিতর মানুষের আত্মা আছে, তোমার জীবন পথে ভেসে যাবার নয়।

যখন ইংলণ্ডে রানী বোর্ডেসিয়া রাজত্ব করছিলেন, তখন বিদেশী এসে তার রাজত্ব আক্রমণ করে। রানী দুই মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে বেরিয়েছিলেন। তার তখনকার সেই মূর্তি দেখলে আমাদের মনেও ভয় হয়। শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে মস্তক অবনত হয়।

মানুষকে যদি ছোট করে রাখা হয়, সে তার শক্তির কথা বুঝবে না। তুমি নারী ব'লে তোমাকে দেশের মানুষ ছোট করে রেখেছে। তোমাকে বিয়ে দিয়েই পুরুষ তার কর্তব্য শেষ করছে। উচচ জীবনের কথা ভাববার আগে নারীকে আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, স্বাধীনভাবে তাকে হাত ও মস্তিষ্কের ব্যবহার শিখতে হবে। যার অর্থ নেই, জীবনের স্বাধীনতা নেই, তার আবার উচচ জীবন কি? বেটা ছেলের মতই নারী, তুমি বেড়ে ওঠ। পুরুষের সাহায্য না নিয়েই তুমি যাতে বেঁচে থাকতে পার, তার জন্যে প্রস্তুত হও।

তোমাকে পুরুষ হাত পা বেঁধে খাঁচার মধ্যে পুরে রেখেছে, এর ফলে তোমার মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়েছে। মানব-সমাজের সঙ্গে মিশলে তুমি বিশ্বে পাপ সৃষ্টি করবে, এর মত অন্যায় কল্পনা আর নেই। তোমার কি নিজের বিবেক নেই? তোমার কি শুদ্ধ জীবনের মর্যাদা বুঝবার ক্ষমতা নেই?

বিশ্বের কেউ যদি তোমাকে সাহায্য না করে, তুমি সে জন্যে কেঁদো না। তোমার ভিতর যে শক্তি রয়েছে, তাকে আজ জাগিয়ে তোল। তুমি লেখাপড়া শেখ। তুমি এত পরাধীনা থেকো না। স্বামী তোমাকে ভাত না দিলেই তুমি নিজের ভাত যাতে সংগ্রহ করতে পার, তার ব্যবস্থা কর। পুরুষ তোমার উপর বহু অত্যাচার করেছে, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমাকে আজ দাঁড়াতে হবে। প্রতিশোধে ঘৃণা নিয়ে নয়, ক্ষমার বিনয় নিয়ে। নিজের জীবন যদি নিরর্থক হয়ে থাকে, তবে তোমার সন্তানের জীবন যেন নিরর্থক না হয়। ছেলের মঙ্গলের জন্যে টাকা ব্যয় কচ্ছ, তোমার অনাথিনী ভিখারিনী মেয়ের কথা তুমি ভাববে না? সে কেমন

করে এ সংসারে বেঁচে থাকবে? যদি সে স্বামীর ভালবাসা না পায়—পরের বাড়ীতে যদি তার স্থান না হয়—যদি তার স্বামী মারা যায়, তা হলে তার কি হবে? এই সহজ কথা তুমি বোঝ না? মেয়েকে সম্পত্তি লিখে দিলেও মূর্খ মেয়ে তা কি রাখতে পারবে? কত নারী আত্মশক্তির অভাবে দারিদ্র্য ভারে জন্মভূমি ত্যাগ করে শহরে অভাগিনীদের জীবন গ্রহণ করে, সে শোকের কথা কি জান?

ফরাসী দেশে এক কৃষকের মেয়ে লক্ষ লক্ষ পুরুষ সৈনিকের অধিনায়িকা হয়ে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তা শুনলে তুমি দুর্বলা অন্তঃপুরচারিকা ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে।

জাতিকে বড় করবার জন্যে, তোমার নিজের জীবনকে বাঁচাবার জন্যে তোমাকে আজ ঘরের বের হতে হবে। ইসলাম তোমার ঘরের মধ্যে থাকতে বলেনি,—তবে কেন তোমার এই বন্দিনী অবস্থা! কে তোমাকে হাত কড়া দিয়ে রেখেছে? সমাজের লজ্জা—দুর্বৃত্ত সমাজকে উপহাস করে, হাতের কড়াকে চূর্ণ করে আজ জীবন-সন্ধানে বেরিয়ে পড়। তোমার গতি সর্বত্র হোক। পাপী লম্পট পুরুষ সমাজ তোমাকে বন্দিনী করে সতী করে রাখতে চায়। তোমার সতীত্বের মর্যাদা কি তুমি নিজে বোঝ না?—একি তোমার অপমান নয়?

পারস্যে আরবে মিসরে হাটে বাজারে বিপনীতে সর্বত্র নারীদের অবাধ গতি ছিল। তারা স্বাধীনভাবে প্রয়োজন হলে এমন কি নির্জনে পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলতেন। পৃথিবীর অতীত কালে কি বর্তমান সময়ে কোন জাতির মধ্যে নারীদের এই বন্দিনী অবস্থা ছিল না ও নেই, অভদ্রভাবে এক কাপড়ে বাইরে বের হওয়া নারী পুরুষ উভয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ।

আরব-মহিলা যুদ্ধক্ষেত্রে যে শক্তি ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা শুনলে তোমার মুখ হয়ত কালো হয়ে যাবে কিন্তু জেনো তোমার ঐ রাঙ্গা মুখ তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না, এ জগতে রাঙ্গা মুখের কোনই মূল্য নেই—রূপকে ভ্রমরের মত মানুষ কিছুক্ষণের জন্য বাহবা দিতে পারে; কিন্তু শক্তি ও গুণ ব্যতীত এজগতে কোন স্থান পাওয়া যায় না। গুণের অর্থ শুধু স্বামী ও শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর ভক্তি নয়।

তুমি সেলাই-এর কাজ শিখতে পার। বই বাঁধাইয়ের কাজ, কাঠের কাজ, কামারের কাজ, সোনারূপার কাজ যে পুরুষ মানুষই করবে এর তো কোন কারণ নেই। দেশের সর্বত্র মেয়ে চিকিৎসকের বহু অভাব রয়েছে। জ্ঞানার্জনে ও লেখাপড়া শেখার কথা যেন সব সময়ই মনে থাকে। নইলে তোমার কল্যাণ হবে না।

গ্রেজ দার্লিং বলে এক খ্রীস্টান বালিকার কথা শুনলে তোমার হৃৎপিণ্ডের রক্ত নেচে উঠবে। তোমার নিজের জীবনের সঙ্গে তার জীবন তুলনা করে দেখ, তাতে তুমি বুঝবে, নারী জীবন উপহাসের নয়। সে মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে জানে। নারী এমন কী অপরাধ করেছে, যাতে সে ছোট হয়ে থাকবে। কি এমন পাপ সে করেছে, যাতে তাকে আঁখি জলে জীবন শেষ করতে হবে?

গ্রেজ সমুদ্রের ভিতর যেয়ে ডুবো জাহাজের যাত্রীদিগকে উদ্ধার করেছিলেন। ভীষণ ঝড়ে সমুদ্রের ঢেউগুলি কি ভয়ানক আকার ধারণ করেছিল, তার মধ্যে নৌকা ভাসান কি সহজ কথা? বিপন্ন হৃদয়ের আশাহীন মৌন কঠিন আর্তনাদে তার নারী হৃদয়ের কি গভীর অনুভূতি জাগিয়েছিল। সমুদ্রে গর্জনকে উপহাস করে, প্রতিমুহূর্তে মরণকে আলিঙ্গন করে এমন অসীম সাহসের কাজ করা কি সহজ কথা? নূরজাহান, রানী এলিজাবেথ, কবি জেবন্নিসা, রিজিয়া, চাঁদ সুলতানা, খনা, জোন এরা সবাই নারী ছিলেন। কুমুদিনী মিত্র, কাজী সোফিয়া খাতুন, রেজিনা গুহ, সরোজিনী, নাইডু, সরলা দেবী, শান্তা ও সীতা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, ইয়াজদানীপত্নী, সারা তৈফুর, সাখাওত হোসেন পত্নী এরা সবাই নারী।

তোমাকে শুধু নিজের কথা ভাবলেও চলবে না। নারীকে আজ নারীর ভিতর প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। শত বোন অন্ধকারে দারিদ্র্যে, ব্যথায় চূর্ণ হচ্ছে, তাদের জন্যে পাগলিনী হয়ে আজ তোমাকে পথে বের হতে হবে। তাদের মধ্যে তোমাকে কথা বলতে হবে, তাদের মধ্যে তোমাকে জীবনের গান গাইতে হবে। পরদা আজ ছিঁড়ে দূর করে ফেলে দাও, ভগ্নির ব্যথায় আজ তোমার সকল কাজে ভুল হয়ে যাক। কাজ শেষে তুমি আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর, তাতে আপত্তি নেই।

আজ নারীর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে—আজ নিঃসহায় হয়ে সবার কাছে আঘাত পেয়ে—সে "বোন, বোন" বলে ডাকছে। তবু কি ঘরের মাঝে বসে থাকবে ?

মোঃ রোকনুজ্জামান রনি
ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা
বই নং-.....
বই এর ধরন-.....

পিতৃ-মাতৃভক্তি

হযরত মুহম্মদ বলেছেন—মায়ের পায়ের তলে স্বর্গ। তিনি আবার বলেছেন—মা-বাপের চেয়ে খোদাই তোমার বেশী আপন।

পিতামাতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তবে সেখানে না করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পিতৃ-মাতৃভক্তি। মায়ের ভিতর সে সত্য মা রয়েছেন তাকেই মেনে নিতে হবে।

উড়িষ্যায় একবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। মানুষ না খেতে পেয়ে মরছিল। প্রথমে টাকা খরচ করে চাল পাওয়া যেতো, শেষে চালেরও অভাব হল। মানুষ পথে বের হল কিন্তু সবারই যে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা। কে কাকে অন্ন দেবে? এরপর মানুষ গাছের পাতা খাওয়া আরম্ভ করল। শেষে তাও ফুরিয়ে গেল। সে দেশে একটা উড়িয়া পরিবার ছিল। দুটি ছেলে আর পত্নী। বাপ তাদের কষ্ট সহ্য না করতে পেরে একদিন কোন্ দিকে বেরিয়ে গেল, আর ফিরে এলো না। যা কিছু ছিল সব বিক্রয় করে ফেলা হল, তবুও ক্ষুণ্নিবৃত্তি হল না। মানুষ যা-তা খেয়ে, জ্বর কলেরায় মরে যেতে লাগল। শেষে দেশে কিছুই রইল না, কেবল রইল উত্তপ্ত বালি আর রৌদ্র। একদিন ছোট ছেলেটি ভিক্ষার জন্যে বের হয়ে সেও আর ফিরে এলো না। মা ক্ষুধা ও ব্যাধির যন্ত্রণায় বিছানায় পড়লেন। তিনি প্রথমে দুই-তিন দিনে সামান্য কিছু মুখে দিতেন, এখন তাও দেন না। দুর্বল অস্থিসার শরীরে কাঁদবার শক্তিও ছিল না। বড় ছেলে ভিক্ষা করে যে দুই-এক মুঠা পায় তাই এনে মাকে খাওয়ায়। সে নিজে কোন দিন খায়, কোন দিন খায় না। মায়ের জন্যে অশ্রুতে তার চোখ ভেসে যায়। মা না খেতে চাইলে সে অনুনয় করে তাকে খাওয়ায়। মা না খেলে কাঁদতে থাকে। ছেলেটির নাম সনাতন।

এইভাবে দুই চার দিন গেল। একদিন সনাতন ভিক্ষায় বের হল। মানুষের দুয়ারে দুয়ারে সে ঘুরছিল আর মায়ের কথা ভাবছিল। সে ভাবছিল

এতদিন মাকে বাঁচাতে পেরেছি, আজ আর পারবো না, মা নিশ্চয়ই মরে যাবে, খোদা একমুঠা চালের জোগাড় তুমি করে দাও। মা আমার পথ চেয়ে আছে। পিতা কোথায় চলে গেছেন, ভাইও ভিক্ষায় বের হয়ে আর ফিরে এলো না।

সেদিন সনাতনের চরণ জড়িয়ে আসছিল, তবুও সে হাঁটছিল। এক ব্রাহ্মণের বাড়ীর দুয়ারে এসে সে ভিক্ষা চাইল। ব্রাহ্মণ বড় দয়ালু, কিন্তু তা হলে কি হয়? তার ঘরেও বেশী কিছু ছিল না। বালকের শীর্ণ চেহারা দেখে বললেন, বাবা আমরা যা রেঁধেছি তারই এক মুঠা তোমায় দিচ্ছি,—কিন্তু এত অল্প অন্নতে তোমার কি হবে? সনাতন বলল—আমায় তাই দিন, তাই আমি নিয়ে যাব। ব্রাহ্মণ সনাতনকে বসতে বলে বাড়ীর ভেতর থেকে কিছু ভাত এনে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় বসে খাবে?

সনাতন বলল—আমি খাব না। সঙ্গে নিয়ে যাবো। ব্রাহ্মণ বললেন—সে কি? এত অল্প ভাত কোথায় নিয়ে যাবে? এখানে বসেই খাও।

সনাতন বিনীতভাবে বলল—না মহাশয়, একমুঠা ভাত হলেও আমাকে বাড়ী নিয়ে যেতে হবে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করল, বালক বলল—মা আমার তিন দিন না খেয়ে ঘরে পড়ে আছে। মায়ের কথা বলতে যেয়ে সনাতন কেঁদে ফেললো।

ব্রাহ্মণ বালকের কথা শুনে নিতান্ত ব্যথিত হলেন। এবার তিনি কিছু বেশী করে ভাত আনতে গেলেন; কিন্তু ফিরে এসে দেখলেন দুর্বল শরীরে হঠাৎ মানসিক উত্তেজনায় সনাতন মাটিতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। শরীরে তার প্রাণ নাই।

সনাতনের অতুলনীয় মাতৃভক্তি চিরকালই মানুষের ভক্তি অশ্রু আকর্ষণ করবে।

পিতামাতা অনেক সময় ছেলেদের অবাধ্য বলে গালি দিয়ে থাকেন। ছেলে যদি অবাধ্য হয় তবে তার কারণ পিতামাতার জ্ঞানের অভাব। বুদ্ধিহীন সৈন্যাধ্যক্ষ যেমন সৈন্যদেরকে চালনা না করতে পেরে নিজেদেরই অযোগ্যতার পরিচয় দিয়ে থাকেন, পিতামাতাও তেমনি অবাধ্য

ছেলের নিন্দা করে নিজেদের হালকামির পরিচয় দেন। মানুষ সব জায়গাতেই মানুষ ; অন্যায় রকমে আঘাত পেলেই সে ক্ষেপে উঠবে। কিরূপ ব্যবহার করলে ছেলেরা চরিত্রবান, বিনয়ী ও ভক্তিমান হয়ে উঠে, তা এখানে বলা কঠিন। একদিক হতে কোনকালে ভক্তির উৎস বয় না। স্নেহ বিচক্ষণ ব্যবহার ও নিরন্তর সন্তানের মঙ্গলকামনা ছেলেমেয়েকে বাধ্য করতে সক্ষম। শিশু ও ছেলেমেয়েরা বিচক্ষণ ঋষি নয়, মুরুব্বীদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হবে, তা তারা জানে না। পিতার জন্যে যদি প্রাণ দিতে হয়, তা তারা চিন্তা ও যুক্তিতর্ক না করে দেবে। শিশু ও যুবকের মনকে যুক্তি দিয়ে বশ করতে যাওয়া বড়ই ভুল। ক্রুদ্ধ হলে ছেলেরা আল্লাহ্‌কে অপমান করতে ইতস্ততঃ করে না, সে যে অবোধ।

অতিরিক্ত স্নেহে অনেক সময় পুত্র-কন্যাদের নৈতিক অধঃপতন হয়। লোকে বলে—চোরের পুত্র চোরই হয়ে থাকে। পিতামাতার স্নেহের শক্তি এত বেশী যে, তা ভেবে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। মানুষকে কঠিনভাবে আঘাত করলেও সে তার পিতামাতার সংস্কার ত্যাগ করতে পারে না। তাই অনেক সময় পিতা বা মাতার রূঢ় ও কঠিন ব্যবহার আশীর্বাদ স্বরূপ মানব জীবনের সমূহ কল্যাণ করে থাকে।

পিতা কঠিন আঘাত করেছেন সন্তানকে তা কিন্তু নীরবে মেনে নিতে হবে। অসহ্য হলে দূরে সরে যেতে পার, তার সঙ্গে কলহ বিবাদ করা কাপুরুষতা। বিয়ে হলে পুত্রবধূর সঙ্গে কোন কোন স্থলে পিতার মিল হয় না, ফলে পুত্রের সঙ্গেও অনেকটা অপ্রীতিকর সম্বন্ধ এসে জোটে। বহু অপদার্থ মানুষ পিতৃভক্তির ভুল অর্থ বুঝে পিতার মনোরঞ্জনের জন্যে পত্নী ত্যাগ করে। এদের মত পিতৃদ্রোহী আর নেই। পিতার ভিতর যে সত্য পিতা রয়েছেন, তাকেই মানতে হবে। পিতার অসত্যকে বরণ করে অনেক পিতৃভক্ত সন্তান পিতার আদর লাভ করে, এরা সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করলেও এদের মূল্য খুব কম। পুরুষের নিঃসহায় পত্নীর প্রতিও একটা কর্তব্য রয়েছে।

পিতামাতার অবস্থা যদি শোচনীয় হয়, অন্যাভাবে তাঁরা যদি উপবাসী থাকেন, তাহ'লে তাদের জন্য সম্পদশালী ব্যক্তির অর্থ প্রয়োজন মত না

বলে নিলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু তা যদি না হয় তবে পিতার অর্থলালসা বা তাঁর সুখের জীবনযাপনের জন্যে তুমি অধর্ম করে পয়সা উপায় করতে পার না। তাতে তোমার পিতা যদি তোমায় অভিশাপ দেন কোন ক্ষতি নেই।

মিবারের রাজা মাড়বার রাজকন্যার সঙ্গে ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। যখন কথা হচ্ছিল তখন রাজা রহস্য করে বলেছিলেন—আমার মতো বুড়োর হাতে কেউ মেয়ে দেবে না। এ রহস্যের মাঝে এতটুকু দুর্বলতা ছিল না। পুত্র সে কথা শুনে বললেন—আমার বাপের সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে হোক।

পুত্রের কথা শুনে রাজা ছেলেকে ডেকে বললেন—আমি বুড়ো হয়েছি, তোমাকেই এখন সংসারী হয়ে সব ভার নিতে হচ্ছে। পাগলের মত এ কি কথা বলছো?

পুত্র বললেন—আমি এ মেয়েকে বিয়ে করতে পারবো না।

রাজা কিছু বিরক্ত হয়ে পুনরায় বললেন—দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। বিয়ে না করলে কি কাণ্ড হবে, তা কি তুমি বুঝতে পারছ না?

পুত্র পুনরায় বললেন—আমার দ্বারা এ কাজ অসম্ভব। ক্রমে রাজা ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এদিক দিনও ঘনিয়ে আসছিল। রাজ-কন্যার নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হওয়া চাই, নইলে সর্বনাশ হবে। রাজা আর একবার পুত্রকে ডেকে তাকে বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। এবার রাজা কঠিনভাবে বললেন—পুত্র তবুও অসঙ্কোচে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। এবার রাজা আরও কঠিনভাবে বললেন,—বেশ, আমিই এই বালিকাকে বিয়ে করছি কিন্তু ঠিক জেনো এর গর্ভে যদি কোন সন্তান হয় তবে সেই সিংহাসনে বসবে। পুত্রকে ভয় দেখিয়ে পথে আনবার জন্যেই রাজা একথা বলেছিলেন কিন্তু তবুও পুত্র পিতার মতই কঠিন ভাষায় বললেন—ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, আমি আপনার সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করলাম।

মা মরলে পিতা অনেক সময় দ্বিতীয় বিয়ে ক'রে থাকেন, এতে অনেকে বিরক্ত হয়—নতুন মাকে অপমান ও অপ্রস্তুত করতে আনন্দ অনুভব করে। পুত্রের পক্ষে পিতার প্রতি এর মত দুর্ব্যবহার আর নাই। নতুন

নারীকে 'মা' বললে তো কোন দোষ হয় না,---এতে মৃত মায়ের প্রতি অসম্মান দেখান হয় না। এ যে মনে করে তার মন খুব ছোট। হারানো মার আসন পুরোতে, আর একজন নারী যে এলেন, সে জন্য নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে কর। মানুষ পথের নারীকে মা বলে আনন্দ অনুভব করে, আর তুমি তোমার পিতার পত্নীকে মা বলতে সঙ্কোচ বোধ কর? নতুন মা ছেলেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এ কথাটা অন্যায়। বর্বর সমাজে শুধু মা বলে নয়, প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি কঠিন ব্যবহার করতে আনন্দ বোধ করে। আপন মৃত মায়ের মত নতুন মায়ের সহ্য করার ক্ষমতা না থাকতে পারে। সে যদি দৌরাত্ম্য সহ্য না করতে পেরে শিশুকে একটু মারে, সে জন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না। তার স্বভাব ও মন নিষ্ঠুর নয়। পর বললেই মানুষ পর হয়ে যায়। তৃষিত পথের কুকুরকে মানুষ গালি দেয়, নিজের স্বামীর পুত্র-কন্যাগণকে নারী কেন ভালবাসে না? মানুষ প্রেম হতে জন্মেছে, ভালবাসা তার স্বভাব।

সৎমাকে সৎমা বলে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা করো না। মায়ের মৃত্যুর পর পিতার বিবাহে কখনও অসন্তোষ প্রকাশ করবে না। বাপ বুড়ো হয়ে গিয়েছেন এ বয়সে তাঁর বিয়ে করা অন্যায়। এ সমস্ত কথা বলা নিতান্তই অভদ্রতা। বুড়ো মানুষের বালিকার সঙ্গে বিয়ে আমি সমর্থন করছি না। নতুন মায়ের ছেলে হলে, তারা সম্পত্তির অংশ পাবে এই ভয় পোষণ করাও নীচাশয়তা। বাপের সম্পত্তি ভোগ করার জন্যে তোমার এত লালসা কেন? যতদিন নিঃসহায় ছিলে, ততদিনই তোমার অপরের সাহায্য প্রয়োজন ছিল। যে সমস্ত পুত্র পিতার সম্পত্তির লোভে ক্ষুধিত শৃগাল হয়ে বসে থাকে, তারা অপদার্থ। বিশ্বকে মানুষ সর্বস্ব দান করছে, তুমি তোমার ভাইকে তোমার নিজের অংশ দিতে কষ্ট বোধ করবে কেন? হোক না যত ইচ্ছা ভাইবোন, তাদের সকলকে নিয়ে ইসলামের সেবায় জীবন উৎসর্গ কর।

মৃত মায়ের সম্পত্তি নিয়ে অনেক পিতাপুত্রে মনোমালিন্য হয়। পুত্র পিতার সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করতে কষ্ট বোধ করে না। শিশুকালে যে একবার তোমায় চুমো খেয়েছে তার কাছে তুমি কতখানি ঋণী, আর পিতা

কলিজার স্নেহ দিয়ে তোমায় পালন করেছেন, তাঁর সঙ্গে কি কোন আড়ি করা যায়? পিতা যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পুত্রকে দূর হয়ে থাকতে বলেন তবে নীরবে তার ইচ্ছা মতই কাজ করতে হবে, তার প্রতি ক্রোধ পোষণ করা ঠিক নয়।

অত্যধিক পিতৃভক্তিতে পত্নী ত্যাগ করা কিংবা পত্নীকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া মনুষ্যত্ব নয়; পত্নীর দাবী শোধ দিবার জন্যে যদি পিতাকে অসন্তুষ্ট করতে হয়, তবে তা করতে হবে।[১] যদি পত্নীর সম্ভ্রম রাখবার জন্যে জমিদারী ত্যাগ করতে হয় তাতেও তোমার মনুষ্যত্বের অবমাননা হবে না। পিতার খেয়ালের মূলে একটা মানুষ হত্যা করা মানুষের ধর্ম কখনও অনুমোদন করে না।

পিতার মৃত্যুর পর নতুন মায়ের প্রতি কখনও অসদ্ব্যহার করবে না। এরূপ করা কাপুরুষতা।

সামান্য সামান্য ব্যাপারে পুত্রকন্যারা পিতামাতার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করবে, তা পিতামাতারই তাদের শিশু অবস্থায় শেখান কর্তব্য। নইলে এসব তারা কোন কালে নিজে শিখবে না।

মা যদি অল্পবয়সে বিধবা হন, তবে তাঁকে পুনরায় বিয়ে করতে বলা উচিত। এতে কিছুমাত্র অসম্মান বা লজ্জা নেই। হীনব্যক্তির ঘরে যেয়ে যদি তার কোন অসম্মান হবার ভয় থাকে তবে সেজন্যে অভিভাবক হয়ে পূর্ব হতেই মাকে সতর্ক করবে; তাই বলে তাঁর স্বামীর মতের উপর হস্তক্ষেপ করো না। যারা এ বিষয়ে কোনও প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করে তারা নিতান্তই ঘৃণিত জীব।

পুত্রকন্যা যেদিন ভূমিষ্ঠ হয়, সেদিন মনে ভেবো—আজ আল্লাহ্‌র বান্দা আমার ঘরে এসেছে; না জানি খোদা তাকে কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য জগতে পাঠিয়েছেন। আমি পিতা নই—আমি আল্লাহ্‌র বান্দার সেবক। যে পিতা তার পুত্র-কন্যাগণ সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা করতে পারেন, তিনি কত বড়—তাঁর পুত্রেরা মহাপুরুষ হবে না কেন? জনক-

১ আমরা এই স্থলে লেখকের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। সঃ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

জননীর জন্য তারা অকুতোভয়ে হাসতে হাসতে তলোয়ারের সামনে যেয়ে দাঁড়াবে।

মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুকে পালন কর; সে বড় হয়ে তোমার জন্যে হৃদয়ের রক্ত দেবে।

মা যদি বিধবা হন, তবে দিনের মধ্যে বসে তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ের গল্প করা চাই। বউ নিয়ে যদি বিদেশে থাকতে হয় তাহলে মায়ের বিশেষ ইচ্ছা ব্যতীত তাকে একাকিনী বাড়ীতে ফেলে রাখবে না। বৃদ্ধ বয়সে নারীর একমাত্র অবলম্বন পুত্র; তার সঙ্গ হতে বঞ্চিত থাকা তার অবলম্বনহীন জীবনে খুবই বেদনার কথা। অনেক মা নিজের সুখের কথা না ভেবে অনবরত পুত্রের মঙ্গল ও সুখের কথা চিন্তা করেন। এই জন্যেই মায়ের কথা বেশী করে ভাবতে হবে।

বিয়ের পর কোন কোন পিতামাতা মনে করেন ছেলে পর হয়ে গিয়েছে; পুত্রবধূর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করে পুত্রের মনকে নিতান্ত অস্থির করে তোলেন। জীবনের এই অবস্থাটা বড়ই সমস্যাপূর্ণ। নানা ফন্দি করে, পিতামাতা ও পত্নী উভয় পক্ষেরই মন রক্ষা করতে হবে। পিতামাতা যতই কেন অন্যায় কথা বলুন, তার বিরুদ্ধে সন্তানের কিছু বলবার নেই। মনের কষ্ট বুকে চেপে রেখে সব নীরবে সহ্য করতে হবে। পিতামাতার সঙ্গে কদাপি রোষপূর্ণ বাক্য ও উগ্র ব্যবহার করবে না। সন্তানের পক্ষে এ বড়ই অগৌরবের কথা।

এক রাজা বেড়াতে বের হয়ে প্রজাদের অবস্থা দেখতেন। প্রজারা নানা উপহার দিয়ে রাজা-রানীকে সম্মান জানাচ্ছিলেন। এক বৃদ্ধ তার সাতটি পুত্র এনে রাজাকে বললেন—হে সত্যের প্রতিনিধি, আমার আর কিছু নেই,—দেশ-কল্যাণের জন্যে আমার এই সাত পুত্র আপনাকে উপহার দিচ্ছি।

রাজা বৃদ্ধকে বললেন—আপনার এই দানের চেয়ে আর কোন দানই শ্রেষ্ঠ হয়নি। আপনার এই শ্রেষ্ঠ উপহার আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। সত্যের সেবকের কাছে সত্যের সৈনিকই শ্রেষ্ঠ উপহার।

যে পিতা দেশ-কল্যাণের জন্যে পুত্রগণকে দান করতে পারেন তিনিই শ্রেষ্ঠ পিতা। যাদের এমন পিতা পাবার ভাগ্য হয়েছে জীবন

তাদের সার্থক। পিতার মঙ্গল উদ্দেশ্যের মুখে যদি জীবন বলি দেওয়া যায় তবে তার মত পিতৃভক্তি আর নেই। হযরত ইব্রাহিম যখন বললেন, পুত্র, সত্য তোমাকে আহ্বান করছে। তোমার হৃদয়-রক্ত দিয়ে সত্যের মর্যাদা রাখতে হবে। শিশু তখনই বললেন—বাপ, এতেই তো জীবনের সার্থকতা।

সত্যের জন্যে তোমার যা কিছু আছে সব উৎসর্গ করতে হবে। কারবালার মরুমাঠে তৃষ্ণায় এক এক করে মরতে হবে তথাপি অসত্যকে নমস্কার করতে পার না।

যে পিতা জীবনকে এমন করে সার্থক করে দেবার জন্যে আহ্বান করেন, তিনি ধন্য। এস বিশ্বের সকল সন্তান তাঁকে সালাম করি।

পিতাকে ভক্তি করি কেন? তিনি আমার শরীরটাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন সেই জন্যে মনুষ্যত্বকে অবমাননা করে, তার প্রাণপণ চেষ্টায় জীবনকে সুখী করতে পেরেছি, এই জন্যে? আমি তার উপার্জিত অর্থে আরামের পথ নিরাপদ করতে পেরেছি এ জন্যে? না, না, না—সে জন্যে নয়। আমি চাই মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা, আমি চাই মানুষের সত্য জীবনের উদ্ধার, আমি চাই অবিচারের অবসান, আমি চাই দুঃখের অবসান। আমার সাধনাকে আমার পিতা তারস্বরে মনে করে দিয়েছেন। এ জীবন ব্যর্থ হবার নয়। আঁধার রাতে আমার পিতা আমার পাশে জীবনের মহা সঙ্গীত শুনিয়েছেন; আমি স্পন্দিত প্রাণে তার মুখের দিকে চেয়েছিলাম, তিনি আমার বুকে হাত দিয়ে বলেছিলেন, ভয় নেই। তুমি শক্তি,—এই আঁধার সাগর পাড়ি দিয়ে তোমাকে আলোকের রাজ্যে দাঁড়াতে হবে—তুমি অনন্ত, বিনাশ তোমার নেই; তুমি বিরাট—তুমি ছিলে—তুমি আছ—তুমি থাকবে। আমার দেহ, মন, প্রাণ, রক্ত, শিরা সবগুলি তরল হয়ে পিতার চরণ সিক্ত করেছিল।

এমন পিতার বিদ্রোহী সন্তান হয়ে কি আমি নিজেকে হত্যা করতে পারি? তা হলে বিশ্বের সকল গান যে আজ থেমে যাবে। আজ আকাশ-বাতাসে কেবল ক্রন্দন জেগে উঠবে।

তুমি পিতাকে সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়াও, মাতাকে বহুমূল্য পোশাক দাও, আজ্ঞা পালনের জন্যে নত মাথায় তাঁদের সামনে দাঁড়িয়ে থাক, এই দেখেই আমি তোমাকে পিতৃ-মাতৃভক্ত বলতে পারবো না। আমি জিজ্ঞাসা করবো—তোমার স্বভাবে কলঙ্ক আছে কি না? তুমি চরিত্রবান কিনা? মানুষ তোমার সৎগুণের কথা বলে কিনা? তোমার স্পর্শে এসে নরনারীকে বিপন্ন হতে হয় কিনা? মানব শিশুকে তুমি স্নেহ কর কিনা? যদি কোথাও কোন উত্তর না পাই—আমি বলবো তুমি পিতৃ-মাতৃভক্ত নও—তুমি বিদ্রোহী অভাগা।

দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে পিতামাতার স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে না----ভুল করে তা যেন কেউ মনে না করে।

এক ভদ্রলোক সভার মাঝে বলেছিলেন, আমি আমার সন্তানগণকে দেশের কাজে দান করলাম। সন্তানেরা বন্ধুবান্ধবের কাছে বলেছিলেন—পিতার ইচ্ছায় আমরা আমাদের জীবন নষ্ট করতে পারিনে। এরা বৃদ্ধ পিতাকে যথেষ্ট সম্মান করতেন, তারা পিতার সর্বপ্রকার সুখের ব্যবস্থা করে দিতেন; তবুও এদের পিতৃভক্ত বলতে আমার সঙ্কোচ হয়। যে পুত্র পিতার জড়দেহের সেবা করেই তৃপ্তি লাভ করে তার ভক্তি নিকৃষ্ট। পিতার সত্য ও আত্মার বাণীতে যে সাড়া দেয়, ভক্তি পথে তার স্থান অনেক উচেচ। পিতার আত্মার আদেশকে অবমাননা করে যে তার দেহের সুখ দান করে সে কাপুরুষ; পিতার আশীর্বাদ পাবার উপযুক্ত সে নয়। লোক মুখে অনেক সময় শুনেছি, দরিদ্র পিতা পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলে পুত্র লজ্জা করে বন্ধুবান্ধবদের কাছে তাঁর পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেছেন। পিতা যদি দরিদ্র হন সে জন্য তো লজ্জার কিছু নেই। কার্লাইল সব সময়েই নিজেকে চাষার ছেলে বলে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেছেন। এ জগতে বহু মহাপুরুষ জন্মেছেন, তাঁরা খুব দরিদ্রের ছেলে। আত্মশক্তিতে নিজের সাধনায় মানুষ বড় হয়। বাপের দারিদ্র্য তোমাকে ছোট করে না।

তুমি যদি ছোটলোকের ছেলে হতে তাতেও তোমার লজ্জার কোন কারণ নেই। হীন চরিত্র পিতামাতার স্নেহ অনেক সময় মানুষকে নীচ ও ছোট করে রাখে। কিন্তু তোমার মধ্যে যে তোমার পূর্বপুরুষের নীচতা

রয়েছে—সে কথা বলবার আগে আমাকে অনেকখানি ভেবে দেখতে হবে। হীন বংশে জন্মেছ বলেই যদি কেউ তোমাকে ছোট মনে করে, আমি তাকে ঘৃণা করি। ছোটলোকের ছেলে ছোট হয় কোন্ সময়ে? যখন তার মধ্যে আত্মশুদ্ধির কোন প্রচেষ্টা না থাকে, বিবেক যেখানে স্নেহের দানে দুর্বল হয়ে পড়ে; যেখানে একটা নিরর্থক দাম্ভিকতা বিদ্যমান থাকে, যেখানে অহঙ্কার নিজের ভুল বোঝবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যেখানে আত্মা নির্মল, শুদ্ধি সাধনায় সদাই সজাগ; মনুষ্যত্বের আহ্বানে চঞ্চল, সেখানে কি আমি তোমায় ঘৃণা করতে পারি? যে সত্য সাধকের কুৎসা রটনা করে; তাকে দুর্বল করে ফেলতে চায়; তার নামায রোযা বৃথা। খোদার সঙ্গে যে আত্মীয়তা করেছে, হউক সে দাসীর ছেলে, তাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। খবরদার তাকে অসম্মান করো না।

মা বাপ ছোট হলে তার পরিচয় দিতে কখনও লজ্জা বোধ করো না। যদি কেউ ঘৃণা করে তার সঙ্গে তুমি সম্বন্ধ নষ্ট করে ফেলো। যে বন্ধু তোমার বাপকে স্বীকার করে না, তার সঙ্গে তোমার কোন বন্ধুত্ব নেই। বাপের অপমান শুনে, তোমার বন্ধুরা প্রকাশ্যে না হোক অন্তরালে হাসতে পারেন, তা বলেও তোমার লজ্জা বোধ করবার দরকার নেই। তুমি যখন তোমার পাগল বাপের মুরুব্বীয়ানা সহ্য করতে পেরেছ, তখন তোমার বন্ধুরা কি দুই মিনিটের জন্যে তা পারবে না? সভার মাঝে হোক, গোপনে হোক, পিতামাতার সঙ্গে দেখা হলেই সমাজের রীতি অনুসারে তাকে সম্ভ্রম জানাবে।[২]

বাপের নামের সঙ্গে কোন উচ্চ উপাধি নেই বলে লজ্জাবোধ করবার দরকার নেই। তাঁর নাম লিখতে অনর্থক একটা মুনশী উপাধি লাগালে তাঁকে অপমান করা হয়। উপাধি ব্যবহার জিনিসটা নিতান্তই আপত্তিজনক। নামের সঙ্গে যারা আজকাল চৌধুরী, খাঁ ও কাজি উপাধি লাগান, তাঁরা হয়ত বলতে চান আমরা অন্যান্য মুসলমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। খুব বিস্ময়ের কথা সন্দেহ নেই।

প্রবন্ধ লেখকের বংশকে লোকে জরদার বংশ বলে থাকে। জরদার অর্থ স্বর্ণ অথবা ধন সম্পত্তির মালিক। বড়লোক ছাড়া কারো এই উপাধি

২ পিতামাতা ছাড়া অন্য কারো পদচুম্বন করা নিষিদ্ধ।

হয় না। নদীয়া জেলায় অনেক ব্রাহ্মণের এ উপাধি আছে; সুতরাং এ উপাধি ব্যবহার করতে মনে গর্ব ছাড়া লজ্জা আসে না। কিন্তু বিবেকের কাছে অনুমতি চাইলে সে জিজ্ঞাসা করেছে তোমার অর্থ কই? আর অর্থ যদিই থাকে, তবে তা লোকের কাছে প্রচার করা কি প্রকার ভদ্রতা?

কোন্ সালের টাকা, কে আমাকে দিয়েছে, এ পূর্বে কার বাক্সে ছিল তা আমার জানবার দরকার নেই---আমি শুধু একটিবার তাকে বাজিয়ে দেখবো।

সংসার যখন ভারী হয়ে ওঠে, যখন ছেলেপিলে, দাসদাসী, আত্মীয়-স্বজনে ঘর ভর্তি হয়ে পড়ে তখন অনেক সময় বুড়ো বাপ-মায়ের বড় অসম্মান হয়।

এক বাড়ীতে আমি দেখেছিলাম, পিতার জমিদারী সবাই ভোগ করছে অথচ সকলের খাওয়া শেষ হলে বাইরে অতিথির মত পিতাকে ভাত দেওয়া হয়। খাবার সময় তাকে পানি দেবার লোকও থাকে না।

ছেলের মাথার চুল পেকেছে বলে কি সে বাপকে 'বাপ' বলে ডাকতে লজ্জা বোধ করবে? কে এই নরাধম? আমি তাকে দেখতে চাইনে।

পিতা বা বুড়ো মায়ের অনর্থক বকাবকি শুনে যে ধৈর্য হারিয়ে উপহাসের হাসি হাসে সে অপদার্থ। মানুষ বুড়ো হলে শিশু হয়, শিশুর মতই তাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরতে হবে।

এক ইংরাজ পরিবারে বুড়ো দাদাকে নিয়ে ছেলেমেয়েরা কৌতুক করতো। বুড়োকে যেন তারা বানর বলেই মনে করতো। বুড়োর নিজের ছেলেও যেন এজন্য বেশ আনন্দ উপভোগ করতেন, বাঙ্গালী পরিবারে বুড়ো দাদাকে নিয়ে যেন কোন কৌতুক রঙ্গ না হয়।

ক্রুদ্ধ হয়ে বাপকে 'বাপ' বলে ডাকতে কখনও লজ্জা বোধ করো না; শিশুকালে কতবার তোমার মা তোমাকে কোলের কাছ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, অপমান জ্ঞান বিসর্জন দিয়ে 'মা' 'মা' বলে তার বুকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছ; আজ বড় হয়ে ছেলেমেয়ের বাপ হয়ে সে কথা ভুলে গিয়েছ? জননীর বুকের ক্ষীরধারা এখনও যে তোমার মুখে লেগে

রয়েছে। সম্ভব হলে জননীর পাশে শেষ শয্যা গ্রহণ করো তবু মায়ের অঞ্চল ছেড়ো না।

মা বাপ নীচে বসলে তুমি কখনও উচ্চাসনে বসবে না। উপার্জনক্ষম হয়ে মা-বাপকে রেখে কখনও দধির প্রথম অংশ এবং মাছের মাথা খাবে না, তোমার ছেলে-পেলেকেও দেবে না।

বিপন্ন হয়ে, ব্যাধি পীড়িত হয়ে যদি তোমার পিতামাতা বিছানায় মল ত্যাগ করেন তা হলে নিজ হাতে তা ধুয়ে দেবে। তোমার পত্নী যদি বুদ্ধিমতী হন তা হলে তিনিও তোমার সঙ্গে এসে তোমার পিতামাতার সেবা করবেন।

তুমি এবং তোমার পত্নী ছাড়া পুত্রকন্যা দিয়ে পিতামাতার সেবা করাবে না।

পিতার ধন-সম্পত্তির লোভ বেশী না করে তার সৎগুণগুলি আয়ত্ত করবার জন্যে তোমার আগ্রহ যেন বেশী হয়। সেইটেই হবে তোমার যথার্থ পিতৃভক্তি।

মহাপুরুষকে ভক্তি কর, কিন্তু তার জীবনকে নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোলবার জন্য যদি তোমার কোন সাধনা না থাকে, তা হলে তোমার ভক্তির কোন মূল্য নেই। গান্ধী বা বুদ্ধের মূর্তি পূজা করে কোন লাভ হবে না, যদি তাঁদের শিক্ষাকে গ্রহণ না কর।

বহু মানুষ হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর মহাজীবনের গুণকীর্তন করে, কিন্তু তাঁর জীবনের শিক্ষাকে তারা মানে না। এর মানে কি ভক্তি? পতিত মানুষ এই ভাবেই মহাপুরুষের জীবনকে ব্যর্থ করে দেয়; সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের জীবনকেও ব্যর্থ করে।

পিতাকে অন্ধভাবে ভক্তি করেও কোন লাভ নেই যদি তাঁর চরিত্র মাহাত্ম্যকে তুমি গ্রহণ না কর। পিতা খুব সম্মানী লোক ছিলেন; তাঁর গুণে ও জ্ঞানে সারা দেশের লোক মুগ্ধ ছিল; তাঁর নামে দোহাই ফিরত এই সমস্ত গল্প করে কাপুরুষতার পরিচয় দিও না। তোমার এই সমস্ত অহঙ্কারের গলাবাজী শুনে মন বিরক্ত হয়ে ওঠে।

পিতা মহাজন ব্যক্তি ছিলেন, সে কথা লোক-সমাজে প্রচার করে

নিজের পৌরুষতা বাড়াতে চেষ্টা করো না। পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে তাঁর আত্মার তৃপ্তি সাধন কর। এই আমরা চাই।

উন্নতজীবনকে অনুকরণ করে কত অপরিচিত পথের মানুষ হৃদয়ে শক্তি সঞ্চয় করেছেন আর তুমি পুত্র হয়ে পিতার জীবনকে অনুকরণ করতে পারবে না? পিতার চেয়ে জীবন্ত আদর্শ আর তোমার সম্মুখে কে?

অনেক স্থলে দেখা যায়, যাদের মহিমা ও কর্ম শক্তিতে জগৎ স্তম্ভিত তাদের পুত্রগুলি অপদার্থ। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় কি হতে পারে? জ্ঞানে গুণে, পদমর্যাদায় পিতাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে, এই প্রতিজ্ঞা তুমি কর, তোমার এ কল্পনায় তোমার পিতা কত সন্তুষ্ট হবেন, তা বলা যায় না। তুমি যে তোমার পিতারই প্রতিচ্ছবি।

পিতার অজ্ঞানতার দরুণ বহু মানুষের জীবন বিফল হয়ে যায়, এও সত্য কিন্তু সে কথা তোলবার অধিকার পুত্রদের নেই। যে অবস্থায়ই হোক না মানুষকে সকল অবস্থার ঘাড়ে চড়ে জীবনের পথ কেটে নিতে হবে। বাধা বিপত্তি সকল প্রকার অন্তরায়কে সত্য বলে গ্রহণ করে তোমাকে অগ্রসর হতে হবে।

যুবক বয়সে জীবনে একটা বড় বিপদ আসে, সেটা হচ্ছে অহঙ্কার। পল্লীর দীন মা-বাপের কুটির ছেড়ে এসে প্রাসাদবাসী বন্ধুদের সঙ্গে মিশে মনের গোপন কোণে অজ্ঞাতসারে একটা অহঙ্কার জাগে। বাড়ী যেয়ে ময়লা কাপড় পরা দরিদ্র পিতামাতা, ছিন্নবসনা ভাইবোন, পল্লীবাসীদের অশুদ্ধ ভাষা, অনুন্নত জীবন দেখে মন অহঙ্কারে বলে ওঠে 'বড় বিরক্তিকর।' যখন উচচজ্ঞান ও উচচস্তরের লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে, তখন সাবধান, আপনার জনের সঙ্গে কখনও দাম্ভিক ব্যবহার করো না---বাপ মার সঙ্গে কখনও উগ্রভাবে কথা বলো না। অসভ্য ভাইবোনদের সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করো না; এতে তোমার মনের দীনতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

বিয়ের পর অনেক সময় পত্নী গর্বের অহঙ্কারে মা বাপকে ব্যথা দিতে পারেন। গরীবের ছেলে বড় ঘরে বিয়ে করলে পত্নীর মনে এরূপ অহঙ্কার আসা সম্ভব।

গরীবের ছেলের পক্ষে উচ্চঘরে বিয়ে করতে যাওয়া মূর্খতা ও লজ্জাজনক। যারা তোমার পিতা মাতাকে এতকাল বংশমর্যাদায় ছোট বলে মনে করে এসেছে, তোমার যদি আত্মমর্যাদা জ্ঞান থাকে, তাহলে সম্মানের আশায় তাদের ছায়া স্পর্শ করো না। বিয়ে করে ভদ্রলোক হবার চেষ্টা করার মত অপমান জীবনে আর নেই।

স্বামী যদি বিলক্ষণ টাকা উপায় করেন, অথবা পত্নী যদি অর্থশালিনী হন, তা হলেও তার মনে অহঙ্কার আসতে পারে। সাধারণতঃ নারীর মন অনুন্নত। অনুন্নত মানুষ অর্থ ও ক্ষমতা পেলে তার স্বভাব তো কিছু উগ্র হবেই। পত্নীর ব্যবহারে যদি পিতামাতা কিছু আহত হয়ে থাকেন, তাহলে সাধ্যমত বাপ মায়ের সন্তোষ বিধান করবে; তাদের যথেষ্ট সম্মান করবে।

এ সম্বন্ধে পত্নীর সঙ্গে কোন কথা তুলবে না, তাতে বিপরীত ফল ফলবে। মাতাপিতার প্রতি তোমার ভক্তি দেখে তোমার পত্নী নিশ্চয়ই লজ্জিতা হবেন। যদি এতেও কোন ফল না হয় তবে পত্নীকে কৃপার পাত্র বা বুদ্ধিহীনা মনে করে তার কথা সকলকে অগ্রাহ্য করতে হবে। তার সঙ্গে পিতামাতা সম্বন্ধে কোন কথা উঠলেই নীরব হয়ে যাবে। এই সমস্ত কথা নিয়ে মনকে নিরন্তর শান্তিহীন করে তোলাও ঠিক নয়।

মৃত্যুর পূর্বে পিতা যদি তাঁর সম্পত্তি কোন শুভকার্যে দান করে যেতে চান, তাহলে কদাপি তাঁকে বাধা দেবে না; বরং এই সমস্ত কাজে উৎসাহ দেবে। মানুষের অভাব কোন কালেই পূর্ণ হবে না। পিতা যদি কোন দান করবার শুভ কল্যাণ পোষণ করেন তবে তাতে বাধা না দেওয়াই ঠিক। পুত্র এবং কন্যাদের জন্যে সম্পত্তির কতটুকু রাখা দরকার তা পিতাই ঠিক করে দেবেন। পুত্রকন্যাকে ভিখারী করে যাওয়া পিতার পক্ষে খুবই কষ্টকর। তবে ছেলেমেয়েদের জন্য সর্বস্ব না রেখে যদি কিছু সম্পত্তি দীন-দুঃখী বা কোন সদনুষ্ঠানে দিয়ে যেতে চান, তাতে পুত্রকন্যার মনে আনন্দ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

পুত্র-কন্যার জন্যে মানুষ কত পাপই না করে। জীবন ভরে রাশি রাশি অর্থ জমিয়ে মানুষ রেখে যাচ্ছে কেবল ছেলেমেয়েদের জন্যে। জাতি যখন মানুষের ছেলে-মেয়ের কথা ভুলে শুধু নিজের ছেলেমেয়ের কথা বেশী ভাবে, তখন বুঝতে হবে তারা পতিত।

দুটি যুবকের কথা জানি; তারা ঝগড়া করে বাপকে বন্দুক দিয়ে খুন করে ফেলেছিল। পিতার গালি ও দুর্ব্যবহার সহ্য করবার মত বল যদি বুকে না থাকে, তাহলে বাড়ী ছেড়ে দূর দেশে চলে যাও, সেও ভাল, বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে কাজ নেই। পিতাকে হত্যা করে মহা অন্যায় করো না। জগতে বাপকে কেউ হত্যা করেছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সংসারের সমস্ত অর্থ যদি লাভ হয়, তা হলেও এমন কাজ করা যায় না।

আর দুটো যুবককে জানি, তারা বাপের সঙ্গে কথা বলে না। সর্বত্র বাপের কুৎসা বর্ণনা করে। তবুও মানুষের অপবাদ সহ্য কর, চুপ করে থাকাই উপযুক্ত পুত্রের কাজ। পুত্রকে বুঝতে না পেরে পিতা অন্যায় আচরণ করতে পারেন; তাই বলে তুমি পিতার প্রতি কোন অন্যায় আচরণ করতে পার না। যদি তুমি তাই কর, তা হলে তোমার পিতৃভক্তির পরীক্ষা হবে না। মনুষ্যত্বের জন্য বেদনা সহ্য করলে বড় মনুষ্যত্বের পরিচয় দেওয়া হবে।

মা বা মামুদের সম্পত্তি লাভ করে অনেক পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। এরূপ বিদ্রোহী হওয়াতে জীবনের গৌরব কতখানি নষ্ট হয় ভাষায় কেমন করে প্রকাশ করবো। পিতা নতুন বিয়ে করেছেন, তিনি অত্যাচারী অবিবেচক এ সমস্ত কথা কোন মানুষের কাছে বলবে না। পিতা হাজার অত্যাচারী হলেও তাঁর নিন্দা পুত্রের মুখে শোভা পায় না। সর্বদা নিজেকেই অপরাধী বলে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে। তাতে কোন দোষ নেই। আর এর-ই নাম পিতৃভক্তি।

পিতার নব বিবাহিতা পত্নীর নিন্দা প্রচার করাও দোষের। বুক ভেঙ্গে যদি বেদনা গুমরে ওঠে, জনহীন আকাশ তলে অথবা নির্জন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদ, কিন্তু এই অশ্রুকে ক্ষমা করো না। চিত্তকে ডেকে বলো ওরে মন, তার সুখেই কি সুখী হতে পার না? কেন এ

দুর্বলতা, কেন এ ছেলেমি? যদি মৃত মায়ের কথা মনে হয় তাহলে মনকে বলো মন, এ জগতে অনন্ত মানুষ এসেছিল, এখন কোথায় তারা? সবাইকে যেতে হবে, কেন বৃথা এ আঁখি জল?

কোন কারণে পিতার কাছ থেকে যদি দূরে থাকতে হয় তা হলে সুযোগ সুবিধা পেলেই পিতার সঙ্গে দেখা করো। নতুন মাকে শ্রদ্ধা জানাতে যেন কোন ভুল না হয়। বাপ মায়ের কাছে সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে ফেলে দাও। পিতা যদি অজস্র গালি দেন তবে তাই শোনবার জন্যেই তার সঙ্গে দেখা করবে। পুত্র হয়ে পিতার কাছ থেকে দূর হয়ে থাকা বিধবার আঁখি জলের মতই করুণ ও অন্যায়। পিতার গালি-গুলিতে মনে যেন একটা গোপন আনন্দ হয়, কারণ এরই নাম পিতৃভক্তি।

পিতৃভক্তির অর্থ যেন কেউ না বোঝে পিতার ইচ্ছায় নিজের বিবেককে বিসর্জন দেওয়া। বিবেক অনেক সময় আমাদেরকে ভুল পথে নিয়ে গেলেও সর্বদা তাকেই অনুসরণ করতে হবে। বিবেকের আদেশ পালন না করে মানুষের আর উপায় নেই। বিবেকের অনুবর্তী হয়ে সাধ্যমত আমাদেরকে পিতামাতার তুষ্টি বিধান করতে হবে।

নিজের চিন্তা ও ভাব পিতার কাছে থেকে গোপন করে রাখা ভুল। অনেক সময় পিতাকে শিশু ভেবে বিনয়ে তাঁর কাছে সত্য ও কল্যাণের কথা জানাতে হবে।

সাবধান! পিতার প্রতি ব্যবহারে নিজেকে কোনও প্রকারে রূঢ় অহঙ্কারী করে তুলো না।

নারী জাতিকে পরের ঘর করতে হয়। বিয়ের পরদিন হতেই সে স্বামীর পরিবারের একজন হয়ে যায়। পিতার কুলের কারো প্রতি তার বিশেষ কোন কর্তব্য থাকে না। বিয়ের পর পিতামাতার আজ্ঞাপালন করাই তার পক্ষে কঠিন। যে নারী স্বামীর কথা ভুলে পিতামাতার আজ্ঞানুবর্তিনী হয় সে হতভাগিনী। সত্য কথা বলতে, পিতামাতার প্রতি নারী জাতির বিশেষ কোন কর্তব্য নেই।

নারীর একমাত্র প্রভু স্বামী। স্বামী ছাড়া আর কারো কথা শুনতে নারী বাধ্য নয়।

নারী নিতান্ত অসহায় বলে তার মনুষ্যত্ব স্ফুরণ হবার কোন সুযোগ হয় না। সে যা সত্য বলে মনে করে, তা সে করতে সাহস পায় না। সে জীবনে যা বলে ও করে তা নিজের বলা বা নিজের করা নয়। জাতিত্ব বিবেক ও ভাব স্বাধীনতা তার কিছু নেই। জীবনের দুরবস্থা ও অসহায় অবস্থার কথা স্মরণ করে সে কার কথা শুনবে, কিভাবে চলবে কিছুই ঠিক পায় না। যাবৎ না সে চিন্তা ও কর্মশক্তির স্বাধীনতা পাচ্ছে তাবৎ তার কাছে উচ্চ জীবনের কথা বলা বৃথা।

পিতামাতার কথা শুনতে নারী বাধ্য নয় বলে ব্যথার সময় সুযোগ পেলে নারী প্রাণ দিয়ে পিতামাতার সাহায্য করবে।

কোন কোন স্বামী শ্বশুরকে জব্দ করার জন্য পত্নীকে বাপের বাড়ী যেতে একদম বন্ধ করে দেন। এরা বড় নিষ্ঠুর।

কোন নারীর কথা জানি, তিনি যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে পীড়িতা মায়ের সেবা করেছিলেন, তা অতি আশ্চর্য। দুই-তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রম করেও তিনি মাকে বাঁচাতে পারেননি। অনেক সময় সারাটি রজনী তিনি অনিদ্রায় কাটিয়ে দিতেন।

কারো কারো পিতা বৃদ্ধকালে বহুদিন ধরে রোগ শয্যায় শায়িত থাকেন। বাড়ীর সবাই অগোচরে বিরক্তি ভেবে বলে থাকেন, এ বিপদ আর সহ্য হয় না। কতকাল আর এ ব্যাধি টানতে হবে।

পিতা সম্বন্ধে এরূপ চিন্তা যেন মনে কখনও স্থান না পায়।

---

* বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতির ১৫ই মাঘের (১৩২৮) সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।